ফেলুদা সমগ্র

হত্যাপুরী

সত্যজিৎ রায়

সূচিপত্র

১. ডুংরুর কথা 2
২. নীলাচল হোটেল 8
৩. প্রোফেসর কানুনগো 15
৪. লক্ষ্মণ ভট্টাচার্য 26
৫. মন্দিরের দিকটা 34
৬. ফাইভ স্টার না সিক্স স্টার 42
৭. লালমোহনবাবুর গাড়ি 48
৮. স্নান করে চা খেয়ে 54
৯. হোটেলে এসে মাথায় বরফ 59
১০. ফেলুদা যোগ ব্যায়াম করছে 65
১১. ফেলুদার আর ব্রেকফাস্ট খাওয়া হল না 74
১২. অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা 84

১. ডুংরুর কথা

ডুংরু পাশেই শিশির ভেজা ঘাসের উপর বাজনাটা রেখে শুধু গলায় গান ধরল। ওর কান ভাল, তাই দুদিন শুনেই তুলে নিয়েছে গানটা। হনুমান ফটকের বাইরে বসে যে ভিখিরি গানটা গায়, সে অবিশ্যি সঙ্গে সঙ্গে বাজনাও বাজায়। তাই ডুংরুর শখ হয়েছিল সেও বাজাবে। এই বাজনাটা সবজিওয়ালা শ্যাম গুরুঙের। ডুংরু একবেলার জন্য চেয়ে এনে রেখে দিয়েছে তিনদিন। ছড় টেনে সুর বার করা যে এত শক্ত তা কি ও জানত?

ডুংরু গলা ছাড়ল। সামনে ভুট্টা খেতের ওপরে দুটো মোষ আর কয়েকটা ছাগল ছাড়া কাছে পিঠে কেউ নেই। ডুংরুর ঠিক পিছনেই খাড়া পাহাড়, তার নীচে একটা বাদাম গাছ, তারই ঠিক সামনে ডুংরুর বসার টিবি। ওই যে দূরে ইটের তৈরি টালির ছাতওয়ালা দাতলা বাড়ি, ওটা ডুংরুদের বাড়ি। ভুট্টার খেতটাও ওদের। উত্তরে কুয়াশায় আবছা পাহাড়ের পিছনে তিনটে বরফে ঢাকা পাহাড়ের মধ্যে যেটার চূড়ো মাছের লেজের মতো দু ভাগ হয়ে গেছে, যেটার নাম মাচ্ছাপুছরে, সেটার ডগা এখন গোলাপি।

প্রথম দুটো লাইন গাইবার পর তিনের মাথায় যেখানে সুরটা চড়ে, সেখানে আসতেই আকাশ ভাঙল। গুড গুড শব্দটা শুনেই, ডুংরু এক লাফে পাঁচ হাত পাশে সরে গিয়েছিল, নইলে ওই হাতির মাথার মতো পাথরটা বাজনাটার সঙ্গে সঙ্গে ওকেও থেতলে দিত।

ওরে বাব্বা; ওটা কী–বাদামগাছটার মাথা ফুঁড়ে সেটাকে তছনছ করে একরাশ ডালপালা খুবলে নিয়ে মাটিতে এসে মুখ থুবড়ে পড়ল ওটা কী?

একটা মানুষ।

না, একটা বাবু।

মাথায় রক্ত, থুতনিতে রক্ত, একটা পা হাঁটুর কাছ থেকে দুমড়ে আছে যেন খড়ের পুতুল। লোকটা মরে গেছে কি?

না, ওই যে মাথাটা নড়ল।

ডুংরুর ধাঁ করে মনে পড়ে গেল ওদের কথা। ওই পুবের গমের খেতটা পেরিয়ে রাস্তার ওপারে পাহাড়ের গায়ে ঝরনার ধারে তাঁবু ফেলে যে চারজন আছে-যাদের দাড়ির দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে ডুংরু, কারণ ওর নিজের বাপ খুড়ো দাদু মামা মেসে কারু দাড়ি নেই—যদি কেউ কিছু করতে পারে তো ওরাই পারবে। ওরা চেনে ডুংরুকে; ডুংরু ওদের গান শুনিয়েছে, খেত থেকে ভুট্টা নিয়ে গিয়ে দিয়েছে, ওরা ডুংরুকে পয়সা দিয়েছে—এক টাকা, দুটাকা, এক'দিন পাঁচ টাকা।

ডুংরু দিল ফুট।

হাই, হাই-কাম, জো, কাম।

হোয়াটস আপ?

ডুংরু জিভ বার করে মাথা চিতিয়ে চোখ উলটিয়ে দেখিয়ে দিল। এরা বুঝল। এ ভাষা সকলেই বোঝে।

গো!-জিপ, জিপ!-গো!

এদের জিপের গায়ে রামধনুর রং। এমন গাড়ি ডুংরু দেখেনি কখনও। অনেক গাড়ি সে। দেখেছে বড় প্লান্ত দিয়ে পোখরার দিকে যেতে।

জো, মার্ক, ডেনিস আর ব্রুস উঠে পড়ল জিপে। ডুংরুকে তুলে নিল সঙ্গে। একটা কিছু হয়েছে; দেখা দরকার।

হ্যাঁ, হয়েছেই বটে;

জাম্পিং জেহোশাফ্যাট! সর্বনাশের মাথায় বাড়ি।

চারজনে ঝুকে পড়ল লোকটার উপর। মার্ক মিনেসোটায় ডাক্তারি পড়া ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছে নেপালে।

বেহুঁশ রক্তাক্ত লোকটাকে ধরাধরি করে তুলল। ওরা জিপে।

হাসপাতাল কাঠমাণ্ডুতে। এখান থেকে তেত্রিশ কিলোমিটার।

১

মানুষের হাতে যে রেখাটাকে বিলিতি মতে হেডলাইন বা বুদ্ধির রেখা বলে, ফেলুদার যে সেটা আশ্চর্যরকম লম্বা। আর স্পষ্ট, সেটা আমি জানি। ফেলুদাকে জিজ্ঞেস করলে বলে ও পামিস্ট্রিতে বিশ্বাস করে না, অথচ পামিস্ট্রির বই ওর আছে, আর সে বই ওকে পড়তেও দেখেছি। একবার এটাও দেখেছি—ফেলুদা ওর মাকর্দমারা একপেশে হাসিটা হেসে লালমোহনবাবুকে ওর বুদ্ধির রেখাি়টা দেখাচ্ছে। লালমোহনবাবু অবিশ্যি এ সব ষোলো আনা বিশ্বাস করেন। তাই ফেলুদার হেডলাইনের বহর দেখে দুবার চাপা গলায় অ্যামেজিং কথাটা বলেছিলেন, আর মিনিটখানেক পরে কথার ফাঁকে নিজের ডান হাতের মুঠে খুলে চোখ নামিয়ে রেখাগুলোর দিকে দেখে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলেন।

হাত দেখে মোটামুটি অতীত-ভবিষ্যৎ বলতে আমার ছোট কাকাই পারেন। এমনকী মুখ দেখে ভাগ্য বলে দেবার ক্ষমতাও কারুর কারুর আছে বলে শুনেছি। কিন্তু কোনও লোকের কপালের ঠিক মধ্যিখানে কড়ে আঙুলের ডগা ঠেকিয়ে রেখে চোখ বুজে। সেই লোকের ভাগ্য গণনার ক্ষমতা যে কারুর থাকতে পারে, সেটা এই পুরী এসে প্রথম শুনলাম।

কলকাতায় লোডশেডিং-এ নাজেহাল অবস্থা, তার উপর একটানা গরম চলেছে একশো দশ ডিগ্রি। ছাপাখানায় লোডশেডিং-এর জন্য রহস্য-রোমাঞ্চ ঔপন্যাসিক লালমোহন গাঙ্গুলী ওরফে জটায়ুর নতুন উপন্যাস বৈশাখে বেরোতে পারেনি। ভদ্রলোকের আরও

আপশোঁস এই জন্য যে, এটা ওঁর প্রথম ভীতিক উপন্যাস। ফেলুদাই ওঁকে বলেছিল যে মোমবাতির আলোয় রহস্য-কাহিনীর চেয়ে ভূতের গল্প জমবে বেশি। সত্যি বলতে কী, পিঠাপুরমের পিশাচ গল্পের আইডিয়াটা ফেলুদাই জটায়ুকে দিয়েছিল। কিন্তু সে বই সময় মতো বেরোল না দেখে লালমোহনবাবু রীতিমতো খাপ্পা হয়ে এক রোববারের সকালে আমাদের বাড়িতে এসে বললেন, নাঃ, এ শহরে আর থাকা চলবে না। আর শুনোচেন তো স্কাইল্যাবের ব্যাপার?

স্কাইল্যাব কলকাতায় পড়বে এ খবর কোথাও বেরোয়নি, কিন্তু লালমোহনবাবুর দৃঢ় বিশ্বাস কলকাতার উপর শনির দৃষ্টি পড়েছে, তাই স্কাইল্যাবের একটা বড় অংশ এখানে না পড়ে যায় না। ফেলুদাকে দেখেছি ও প্রায় যে কোনও অবস্থার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে চলতে পারে। ওয়েটিং রুমে জায়গা না পেলে প্লাটফর্মে চাদর বিছিয়ে শুয়ে দিব্যি ঘুমিয়ে রাত কাটাতে দেখেছি কতবার। বালিশও লাগে না-হাত ভাঁজ করে তার উপর মাথা। কিন্তু বাড়িতে বিছানায় শুয়ে ঘণ্টাখানেক না পড়লে যার ঘুম আসে না, তার পক্ষে সেই অভ্যাসটা বন্ধ হয়ে গেলে আর কতদিন মাথা ঠিক রাখা যায়? বই পড়া ছেড়ে কিছুদিন তাস নিয়ে হাত সাফাই অভ্যোস করল। তারপর কিছুদিন মুখে মুখে লিমেরিক বানাল, তার একটা লালমোহনবাবুকে নিয়ে–

বুঝে দেখ জটায়ুর কলমের জোর
ঘুরে গেছে রহস্য কাহিনীর মোড়
থোড় বড়ি খাড়া
লিখে তাড়াতাড়া
এইবারে লিখেছেন খাড়া বড়ি থোড়।

এটা অবিশ্যি জটায়ুকে বলা হয়নি, আর এই লিমেরিক লেখাও বেশিদিন চলেনি। ভাবলে মনে হয়, শহরে রাত্তিরে বাতি না থাকলে হয়তা খুন-রাহাজানি অনেক বাড়বে; কিন্তু দুঃখের বিষয় গত তিন মাসে ফেলুদার কোনও কেস জোটেনি, আর ক্রাইমও যা হয়েছে, সেগুলোর কিনারা পুলিশেই করেছে।

তাই বোধহয় ফেলুদা লালমোহনবাবুর কথায় সায় দিয়ে বলল, সত্যি, কল্লোলিনী তিলোত্তম বড় জ্বালাচ্ছে। শারীরিক অস্বাচ্ছন্দর্যটা মেনে নেওয়া যায়, কিন্তু ক্রমাগত কাজের ব্যাঘাত, পড়াশুনার ব্যাঘাত, মশার কামড়ে চিন্তার ব্যাঘাত—এগুলো বরদাস্ত করা কঠিন।

উড়িষ্যাতে তো একসেস তাই না?

লালমোহনবাবুর এই প্রশ্ন থেকে এল পুরীর কথা, আর পুরী থেকে এল সি-বিচের কাছে নতুন তৈরি নীলাচল হোটেলের কথা, যার মালিক শ্যামলাল বারিক লালমোহনবাবুর বাড়িওয়ালা সুধাকান্তবাবুর ক্লাস-ফ্রেন্ড।

কিন্তু তা হলে কী হবে? সুধাকান্তবাবু খোঁজ নিয়ে জানলেন জুনের মাঝামাঝির আগে ঘর পাওয়া যাবে না।

তাতেও অবিশ্যি আমরা পেছপা হইনি। জুনের মধ্যে কলকাতার অবস্থার উন্নতির কোনও আশা নেই। একুশে জুন আমরা পুরী এক্সপ্রেসে দিয়ে দিলাম রওনা। একবার কথা হয়েছিল যে লালমোহনবাবুর অ্যাম্বাসডরে যাওয়া হবে, শেষে ভদ্রলোক নিজেই এই সময়টায় লং জানিতে মাঝপথে ঝড়বাদল হলে ফ্যাসাদ হতে পারে মশাই বলে পিছিয়ে গেলেন। গাড়ি যাবে, তবে সেটা ড্রাইভার হরিপদবাবু নিয়ে যাবেন; আমাদের এক'দিন পরে পৌঁছবে। পুরী ছাড়াও আরও দু-একটা জায়গা ঘুরে দেখার ইচ্ছে আছে, সেটা নিজেদের গাড়ি থাকলে সুবিধে হবে।

ট্রেনের ঘটনার মধ্যে একটাই লেখার মতো। আমাদের ফোর-বার্থ কামরার একটা আপার বার্থে একজন ভদ্রলোক ছিলেন যিনি সিগারেট খাচ্ছিলেন একটা হাল্ডারে যেটা ফেলুদা বলল সোনার। যে লাইটারে সিগারেট ধরাচ্ছিলেন সেটা নাকি গোল্ড-প্লেটেড, আর তার দাম নাকি তিন হাজার টাকা। যে কেস থেকে সিগারেট বার করলেন সেটা সোনার, চশমা সোনার, শার্টের কাফ-লিংকস সোনার। দুহাত মিলিয়ে তিনটে আংটি সোনার, আর ওপর

থেকে পা বুলিয়ে নীচে নামতে গিয়ে লালমোহনবাবুর কাঁধে বুড়ো আঙুল লাগাতে যখন হেসে সরি বললেন, তখন দেখলাম একটা দাঁত সোনার। পুরী স্টেশনে নেমে কুলির মাথায় জিনিস তুলে ভদ্রলোকটি যখন ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেলেন, তখন লালমোহনবাবু বললেন, ইস, এমন সোনায় মোড়া ভদ্রলোকটির নামটা জিজ্ঞেস করা হল না। ফেলুদা বলল, সেটা জানার একটা সহজ উপায় ছিল। কামরার বাইরে রিজারভেশন চার্ট টাঙানো ছিল হাওড়া থেকেই। ভদ্রলোকের নাম এম. এল. হিঙ্গোরানি।

২. নীলাচল হোটেল

নীলাচল হোটেলে একবেলা থেকেই সেটাকে সিক্স-স্টার হোটেল বলে ঘোষণা করলেন। লালমোহনবাবু। ফেলুদা বলল, হোটেলে সুইমিং পুল না থাকলে সেটা পাঁচ তারার পর্যয়ে ওঠে না; আর পাঁচের উপর রেটিং নেই। আপনি কি দুশো গজ দূরে ওই সমুদ্রটাকে নীলাচলের নিজস্ব সাঁতারের চৌবাচ্চ বলে ধরছেন? তা হলে অবিশ্যি আপনার রেটিং-এ ভুল নেই।

আসলে দুপুরে খাওয়াটা বেশ ভাল হয়েছিল। লালমোহনবাবুকে লোভী বলা চলে না, তবে তিনি রসিক খাইয়ে তাতে সন্দেহ নেই। বললেন, কাঁচকলার কোফতা এত উপাদেয় হয় জানা ছিল না মশাই। এদের কুকিং-এর জবাব নেই। তা ছাড়া তকতকে বেড়ারুম-বাথরুম, সদালাপী ম্যানেজার, ইনস্ট্যান্ট পাখা-বাতি, সমুদ্রের নৈকট্য-সিক্স-স্টার বলব না কেন মশাই?

পুরনো হলে কী হবে জানি না, নতুন অবস্থায় হোটেলটা সত্যিই বেশ ভাল! ফেলুদা আর আমি দোতলায় একটা ডাবলিরুমে আছি, পাশের ডাবল রুমটা লালমোহনবাবু গড়িয়াহান্টার এক কাপড়ের দোকানের মালিকের সঙ্গে শেয়ার করে আছেন। ম্যানেজার শ্যামলাল বারিকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে, বলেছেন সন্ধ্যাবেলা একটু ফাঁক পেলেই আমাদের ঘরে আসবেন।

হোটেলের গেট থেকে বেরিয়ে ডান দিকে মিনিটখানেক গেলেই পায়ের তলায় বালি শুরু হয়ে যায়। আমি শেষ পুরী এসেছি। যখন আমার বয়স পাঁচ বছর। ফেলুদা বছর দুয়েক আগে রাউরকেল্লা এসেছিল একটা কেসে, তখন উড়িষ্যার অনেক জায়গাই দেখে গেছে, পুরী তো বটেই। কেবল লালমোহনবাবু বললে বিশ্বাস করা কঠিন-এই প্রথম নাকি পুরী এলেন। আমরা অবাক ভাব দেখানোয় উনি বললেন, আরো মশাই, কলকাতার ভেতরেই

কত কী আছে এখনও দেখলুম না, আর পুরী; ভাবতে পারেন, আমার বাড়ির তিন মাইলের মধ্যে জৈন টেম্পল; জন্মে অবধি নাম শুনে আসছি, এখনও চোখে দেখিনি।

সমুদ্র দেখে লালমোহনবাবু যে কবিতাটা আবৃত্তি করলেন সেটা আমি কক্ষনও শুনিনি। জিজ্ঞাসা করতে বললেন সেটা বৈকুণ্ঠনাথ মল্লিকের লেখা। তিনি নাকি এথেনিয়াম ইনস্টিটিউশনের বাংলার মাস্টার ছিলেন। লালমোহনবাবু যখন ক্লাস সেভেনে পড়েন, তখন নাকি এই কবিতাটা আবৃত্তি করে প্রাইজ পেয়েছিলেন। বললেন শেষের দুটো লাইন নাকি পার্টিকুলারলি ভাল-আরেকবার মন দিয়ে শোনো তপেশ, তা হলেই বিউটিটা ধরতে পারবে–

‘অসীমের ডাক শুনি কল্লোল মর্মরে
এক পায়ে খাড়া থাকি এক বালুচরে।’

ফেলুদা মন্তব্য করল, কবি নিশ্চয়ই এখানে নিজেকে সারিসের সঙ্গে আইডেন্টিফাই করছেন, কারণ এই ঝোড়ো বাতাসে বালির উপর মানুষের পক্ষে এক পায়ে খাড়া থাকা চাট্টিখানি কথা নয়। যাই হাক, এবার বলুন তো বালির উপর ওই ছাপগুলোর কোনও বিশেষ তাৎপর্য আছে কি না।

বালির উপর দিয়ে কেউ হেঁটে গেছে। পুব থেকে পশ্চিমে। জুতোর ছাপের সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা ছাপ চলেছে, সেটা নিশ্চয়ই লাঠি। লালমোহনবাবু বেশ কিছুক্ষণ ছাপগুলোর দিকে চেয়ে থেকে বললেন, জুতো অ্যান্ড লাঠি সেটা তো বোঝাই যাচ্ছে, তবে বিশেষ তাৎপর্য...

তোপ্‌সে, তোর কী মনে হয়? ।

আমি বললাম, লোকে তো সাধারণত ডান হাতে লাঠি ধরে। এখানে দেখছি। ছাপটা বাঁ দিকে।

ফেলুদা আমার পিঠে একটা চাপড় মেরে দিল, যার মানে সাবাস। তারপর বলল, ভদ্রলোক ন্যাটা হলে আশ্চর্য হব না।

আমরা যেখানটায় এসে দাঁড়িয়েছি সেখানে লোক বলতে তিনটে নুলিয়ার বাচ্চা, তার মধ্যে একটা কাঁকড়া ধরছে, আর দুটো ঝিনুক কুড়োচ্ছে। ভিড়টা আরম্ভ হয় আরও এগিয়ে গিয়ে, যেখানে কাছাকাছির মধ্যে বেশ কয়েকটা বাঙালি হোটেল রয়েছে। আমরা আরও এগিয়ে যাব যাব করছি, এমন সময় পিছন থেকে ডাক এল।

মিস্টার গাঙ্গুলী!

ঘুরে দেখি জটায়ুর রুমমেট, সেই দোকানের মালিক। গোলগল হাসিখুশি মিশুকে লোক, আলাপ হতে জানলাম নাম শ্রীনিবাস সোম, দোকানের নাম হেমাঙ্গিনী স্টোর্স, হেমাঙ্গিনী ভদ্রলোকের মায়ের নাম।

যাইবেন না? ভদ্রলোক লালমোহনবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন। ছয়টায় টাইম দিসে কিন্তু।

লালমোহনবাবু কিছুক্ষণ থেকেই মাঝে মাঝে পিছন ফিরে দেখছিলেন; এবার কারণটা বুঝলাম। কিন্তু-কিন্তু ভাব করে ফেলুদার দিকে চেয়ে বললেন, আপনি তো বোধহয় নট ইন্টারেস্টেড তাই আপনাকে জোর করব না।

ব্যাপারটা কী?

ইয়ে, ইনি এক আশ্চর্য গণকের কথা বলছিলেন। কপালে আঙুল রেখে ভাগ্য বলে দেন।

কার কপালে?

যার ভাগ্য বলছেন তার, ন্যাচারেলি।

কপালের লিখন পড়তে পারেন বলছেন?

শুনে তো তাই মনে হচ্ছে।

ফেলুদা অবিশ্যি কপালের লেখা পড়াতে রাজি হল না। তাও আমরা দুজনে গণৎকারের বাড়ি অবধি গেলাম। ওঁদের সঙ্গে। গণৎকারের বাড়ি বলাটা অবিশ্যি ঠিক হল না; একটা তিনতলা বাড়ির একতলার দুটো ঘর নিয়ে থাকেন। ভদ্রলোক। সমুদ্রের ধার দিয়ে সোজা পুবদিকে নুলিয়া বস্তি লক্ষ্য রেখে গিয়ে যেখানে চেঞ্জারদের ভিড় পাতলা হয়ে এসেছে, সেখানে বাঁয়ে বালির চড়াই উঠে ত্রিশ চল্লিশ গজ গেলে বালিতে বসা একটা পোড়ো বাড়ির কিছুটা দূরেই এই তিনতলা বাড়িটা। গেটের একদিকে শ্বেত পাথরের ফলকে লেখা সাগরিক, অন্যদিকে ডি. জি. সেন। পুরনো ধাঁচের হলেও, বেশ বাহারের বাড়ি। গেট দিয়ে ঢুকে একটা মাঝারি বাগানও আছে।

মালিক থাকেন। ওই তিনতলার ঘরে, বললেন শ্রীনিবাস সোম, আর একতলার বারান্দার পিছনে ওই যে দরজা, ওইটা হইল লক্ষ্মণ ভট্টাচার্যের ঘর।

গণৎকারের নামটা এই প্রথম শুনলাম। বারান্দায় যে আট-দশজন লোক দাঁড়িয়ে আছে, তারাও যে গণৎকারের কাছেই এসেছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

লালমোহনবাবু জয় গুরু বলে সোম মশাইয়ের সঙ্গে গেট দিয়ে ঢুকে গেলেন।

***

কপাল কী বলছে? ফেলুদা জিজ্ঞেস করল। লালমোহনবাবু ভীষণ উত্তেজিতভাবে এইমাত্র ঢুকেছেন আমাদের ঘরে। –অবিশ্বাস্য, অলৌকিক, অসামান্য! বললেন ভদ্রলোক,-সাড়ে সাতে হুপিং কফ, আঠারোয় আছাড়ে পড়ে মালাই চাকি ডিসলোকেশন, প্রথম উপন্যাস, স্পেকট্যাকুলার পপুলারিটি, সামনের বই কটা এডিশন হবে–সব গড় গড় করে বলে দিলেন।

স্কাইল্যাব মাথায় পড়বে কি না বলেছে?

ঠাট্টাই করুন। আর যাই করুন মশাই, আপনাকে একবারটি ধরে নিয়ে যাবই। আর, ইয়ে, বলেছেন আমার বন্ধুভাগ্য ভাল। শুধু তাই নয়, বন্ধুর চেহারার ডেসক্রিপশনও দিলেন।

আর বন্ধুর পেশা?

বলেছেন বন্ধু মেধাবী, কর্মঠ, অনুসন্ধিৎসু, গভীর পর্যবেক্ষণ-শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি। মিলছে? আর কী চাই?

মে আই কাম ইন?

হোটেলের ম্যানেজার শ্যামলাল বারিক ঘরে ঢুকতেই সুগন্ধি জিদার গন্ধে ঘর ভরে গেল। —আসুন। পানের ডিবে খুলে এগিয়ে দিলেন আমাদের দিকে। আমরা ইতস্তত করছি দেখে আশ্বাস দিলেন যে এ পানে জর্দা নেই।

ফেলুদা একটা পান মুখে পুরে চারমিনারের প্যাকেটটা পকেট থেকে বার করে বলল, আচ্ছা, এই ডি. জি. সেন ভদ্রলোকটির পুরো নামটা কী?

দেখেছেন? বলে উঠলেন লালমোহনবাবু, ওঁর বাড়ি থেকেই ঘুরে এলুম, অথচ ওঁর পুরো নামটা জেনে এলুম না। দোলগোবিন্দ নয় তো?

আমি জানি, ভদ্রলোকের পিঠাপুরমের পিশাচ বইতে একটা আধপাগলা চরিত্র আছে যার নাম দোলগোবিন্দ দত্ত রায়।

শ্যামলালবাবু হেসে বললেন, মাপ করবেন মশাই, ওঁর পুরো নাম আমারও জানা নেই। কেউই জানেন কি না সন্দেহ। সবাই ডি. জি. সেন বলেই বলেন। এমনকী ডিজিবাবুও বলতে শুনেছি কাউকে কাউকে।

বেশি মেশেন-টেশেন না বুঝি?

গোড়ায় তবু এখানে সেখানে দেখা যেত। গত বছর সিকিম না। ভূটান কোথায় যেন গিয়েছিলেন; মাস ছয়েক হল ফিরে একেবারে গুটিয়ে নিয়েছেন নিজেকে।

কেন, সেটা জানেন?

শ্যামলালবাবু মাথা নাড়লেন।

বাড়িটা কি ওঁরই তৈরি? ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

না। ওঁর বাপের। বাপের পরিচয় দিলে হয়তো চিনতে পারেন। সেন পারফিউমারস-এর নাম শুনেছেন তো?

হ্যাঁ, হ্যাঁ–কিন্তু সে ব্যবসা তা উঠে গেছে অনেককাল। এস. এন. সেনস সেনসেশন্যাল এসেনসেজ–সেই সেন তো?

ঠিক বলেছেন। ইনি ওই এস. এন. সেনের ছেলে। জোর ব্যবসা ছিল। কলকাতায় তিনটে বাড়ি, মধুপুরে একটা, পুরীতে একটা। ভদ্রলোক মারা যাবার পর ব্যবসা আর বেশিদিন টেকেনি। দুই ছেলের মধ্যে সম্পত্তি ভাগ করে দেন উইল করে। ডি. জি. সেন বোধহয় ছোট ছেলে; তিনি এই বাড়িটা পান। দুই ছেলের কেউই ব্যবসায় যায়নি। ইনি এককালে চাকরি-টাকরি করে থাকতে পারেন, এখন আর্ট নিয়ে আছেন।

আর্ট? ফেলুদার হঠাৎ কী যেন মনে পড়েছে।এনারই কি পুঁথির কালেকশন? আমাদের সিধুজ্যাঠার কাছে পুঁথি দেখেছি আমি। তিনশো বছরের পুরনো তিনটে পুথি আছে ওঁর কাছে। ছাপাখানার আগের যুগে বই লেখা হত হাতে; তাকেই বলে পুঁথি। সবচেয়ে পুরনো কালে একরকম গাছের ছাল সরু লম্বা করে কেটে তাতে লেখা হত, তাকে বলত ভূর্জিপত্র, তারপরে তালপাতা আর কাগজে লেখা হত। সিধুজ্যাঠা বলে পুঁথি জিনিসটা যে আমাদের আর্টের একটা বড় অঙ্গ, সেটা অনেকেই মনে রাখে না।

শ্যামলালবাবু বললেন, পুথি নিয়েই তো আছেন। দেশ-বিদেশ থেকে লোক এসে ওঁর পুঁথি দেখে যায়।

ভদ্রলোকের ছেলেপিলে নেই?

একটি ছেলে তো মাঝে মাঝে আসত, বউকে নিয়ে। অনেককাল দেখিনি। ভদ্রলোক নিজেই এসেছেন বছর তিনেক হল। নিজে থাকেন। তিনতলায়; একাই থাকেন। বিপত্নীক। এক তলায় কিছুকাল থেকে এক পামানেন্ট বাসিন্দা এসে রয়েছেন, এক গণৎকার; দোতলাটা সিজনে ভাড়া দেন। এখন রয়েছে সস্ত্রীক এক রিটায়ার্ড জজ সাহেব।

হুঁ।

ফেলুদা ফুরিয়ে যাওয়া চারমিনারটা অ্যাশট্রেতে ফেলে দিল।

আপনার কি আলাপ করার ইচ্ছে? শ্যামলালবাবু জিজ্ঞেস করলেন। –ভারী পিকিউলিয়ার লোক কিন্তু; ফস করে কারুর সঙ্গে দেখা করতে চান না। অবিশ্যি আপনার যদি পুঁথিতে ইন্টারেস্ট থাকে, তা হলে–

ইন্টারেস্ট কেন থাকবে না; সেই সঙ্গে কিছুটা জ্ঞানও তো থাকা চাই। একটু হোমওয়ার্ক না করে এসব লোকের সঙ্গে দেখা করার কোনও মানে হয় না।

কোনও চিন্তা নেই বললেন শ্যামলালবাবু, যতীশ কানুনগোর বাড়ি আমার এই হোটেল থেকে পাঁচ মিনিটের হাঁটা পথ। র‍্যাভেনশ কলেজের প্রোফেসর ছিলেন, এখন রিটায়ার করেছেন। জানেন না এমন বিষয় নেই। ওঁর সঙ্গে দেখা করুন, আপনার হোমওয়ার্ক হয়ে যাবে।

৩. প্রোফেসর কানুনগো

ফেলুদা যে সত্যিই পরদিন ভোরে উঠে টেলিফোনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে তক্ষুনি প্রোফেসর কানুনগোর সঙ্গে দেখা করতে চলে যাবে, সেটা আমি ভাবিনি। আমার ইচ্ছা ছিল আজ। সমুদ্রে স্নান করব; ও থাকলে একজন সঙ্গী জুটত, কারণ লালমোহনবাবুকে বলাতে উনি আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, দেখো তপেশী, তোমাদের বয়সে রেগুলার সাঁতার কেটেছি। আমার বাটারফ্লাই স্ট্রোক দেখে লোকে ক্ল্যাপ পর্যন্ত দিয়েছে। কিন্তু হেদো আর বে। অফ বেঙ্গল এক জিনিস নয় ভাই। আর পুরীর ঢেউ বড় ট্রেচারস। বাম্বাই-এর সমুদ্র হলে দ্বিধা করতুম না।

সত্যি বলতে কী, আজকের দিনটা স্নানের পক্ষে খুব সুবিধের নয়। সারা রাত টিপটপ করে বৃষ্টি পড়েছে, এখনও মেঘলা আর গুমোট হয়ে রয়েছে। তাই শেষ পর্যন্ত ঠিক হল স্নানটা না হয় ফেলুদার সঙ্গেই করা যাবে, আজ শুধু একটু বিচে হেঁটে আসব। সাতটার মধ্যেই চা-ডিমা-রুটি খেয়ে আমরা দুজন বেরিয়ে পড়লাম। লালমোহনবাবুর কাল রাত থেকেই বেশ খুশি-খুশি ভাব; মনে হয় লক্ষ্মণ গণংকারই তার জন্য দায়ী।

বিচে এসে দেখি খাঁ খাঁ। এই দিনে এত সকলে কে আর আসবে? দুরে জলে দু-তিনটে নুলিয়াদের নীকো দেখা যাচ্ছে। তবে কালকের সেই নুলিয়া বাচ্চাগুলো নেই। তার বদলে কয়েকটা কাক রয়েছে, ঢেউ-এর জল সরে গেলেই তিড়িং তিড়িং করে এগিয়ে গিয়ে ফেনায় ঠোকর দিয়ে কী যেন খাচ্ছে, আবার ঢেউ এলেই তিড়িং তিড়িং করে পিছিয়ে আসছে।

দুজনে ভিজে বালির উপর দিয়ে হাঁটছি, এমন সময় লালমোহনবাবু বললেন, সি-বিচে শুয়ে রোদ পোয়ানোর বাতিক আছে সাহেব-মেমদের এটা শুনিচি, কিন্তু মেঘ-পোয়ানোর কথা তো শুনিনি।

আমি জানি কথাটা কেন বললেন ভদ্রলোক। একজন লোক চিত হয়ে শুয়ে আছে বালির উপর, হাত পঞ্চাশেক দূরে। বাঁয়ে যেখানে বিচ শেষ হয়ে পড়ে উঠে গেছে, সেই দিকটায়। আরেকটু বাঁয়ে শুলেই লোকটা একটা ঝোপড়ার আড়ালে পড়ে যেত।

কেমন ইয়ে মনে হচ্ছে না?

আমি জবাব না দিয়ে পা চালিয়ে এগিয়ে গেলাম। খটকা লেগেছে আমারও।

দশ হাত দূর থেকেও মনে হয় লোকটা ঘুমাচ্ছে, কিন্তু আরেকটু এগোতেই বুঝলাম তার চোখ দুটো খোলা আর মাথার কোঁকড়ানো ঘন চুলের পাশে বালির উপর চাপ-বাঁধা রক্ত।

পুরু গোঁফ, ঘন ভুরু, রং বেশ ফরসা, গায়ে ছাইরঙের সুতির কোট, সাদা প্যান্ট আর নীল স্ট্রাইপড শার্ট। জুতো আছে, মাজা নেই। ডান হাতের কড়ে আঙুলে একটা নীল পাথর-বিসানো আংটি, হাতের নখ কাটা হয়নি। অন্তত এক মাস। কোটের বুক পকেট ফুলে উঁচু হয়ে আছে; মনে হয় কাগজপত্তর আছে। ভীষণ ইচ্ছে হচ্ছিল কাগজগুলো বার করে দেখতে, কারণ পুলিশ তাই করবে, আর তা হলে হয়তো লোকটা কে তা জানা যাবে।

ডোন্ট টাচ, বললেন লালমোহনবাবু, যদিও সেটা বলার কোনও প্রয়োজন ছিল না। ফেলুদার সঙ্গে থেকে এসব আমার জানা আছে।

আমরাই তো ফাস্ট? বললেন লালমোহনবাবু। ভদ্রলোক পকেটে হাত ঢুকিয়ে রেখেছেন, যেন কিছুই হয়নি এমন ভাব, কিন্তু গলার স্বরে বোঝা যায় ওঁর। তালু শুকিয়ে গেছে।

আমি বললাম, তাই তো মনে হচ্ছে।

ভদ্রলোক আবার বিড়বিড় করে বললেন, যাক, তা হলে আমরাই ডিসকভার করলুম।

আমি থা ভাবটা কাটিয়ে নিয়ে বললাম, চলুন, রিপোর্ট করতে হবে।

ইয়েস ইয়েস–রিপোর্ট।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে হোটেলে ফিরে এলাম। ইতিমধ্যে ফেলুদা হাজির। –পাপোশে যখন পা না মুছেই ঢুকলেন, এবং ঘরের মেঝেতে ছটাক খানেক বালি ছড়ালেন, তখন বেশ বুঝতে পারছি আপনি সবিশেষ উত্তেজিত, কফি হাতে খাটে বসে ফেলুদা লালমোহনবাবুকে উদ্দেশ করে বলল।

লালমোহনবাবু ঘটনায় রং চড়াতে গিয়ে দেরি করে ফেলবেন বলে আমি দু-কথায় ব্যাপারটা বলে দিলাম। এক মিনিটের মধ্যে ফেলুদা নিজেই ফোন করে থানায় খবরটা দিয়ে দিল। ওই ভাবে সংক্ষেপে গুছিয়ে আমি বলতে পারতাম না, লালমোহনবাবু তো নয়ই।

খুন সম্পর্কে ফেলুদা শুধু একটাই প্রশ্ন করল–

না, ফেলুদা।

তবে বাঙালি নয়, এ বিষয়ে আমি ডেফিনিট বললেন লালমোহনবাবু।

কেন বলছেন? ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

জোড়া ভুরু, ভয়ংকর কনফিডেনসের সঙ্গে বললেন জটায়ু–বাঙালিদের হয় না। আর ওরকম চায়ালও হয় না। বাজরার রুটি আর গোস্ত খাওয়া চায়াল। যদ্দূর মনে হয় বুন্দেলখন্দের লোক।

ফেলুদা যে ইতিমধ্যে ডি. জি. সেনের সঙ্গে অ্যাপিয়েন্টমেন্ট করে ফেলেছে সে কথা এতক্ষণ বলেনি। সাড়ে আটটায় টাইম দিয়েছেন তাঁর সেক্রেটারি, আর বলেছেন পনেরো মিনিটের বেশি থাকা চলবে না। আমরা পনেরো মিনিট হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

এবারে বিচে পৌঁছে দূর থেকেই বুঝলাম যে লাশের পাশে বেশ ভিড়। খবর এতক্ষণে ছড়িয়ে পড়েছে, পুরীর সমুদ্রতটে এভাবে এর আগে খুন হয়েছে কি না সন্দেহ।

আমি জানতাম যে এখানকার থানার কিছু অফিসারের সঙ্গে রাউরকেল্লার কেসটার সময় ফেলুদার আলাপ হয়েছিল। যিনি ফেলুদাকে দেখে হেসে হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এলেন তিনি শুনলাম সাব-ইনস্পেক্টর মৃত্যুঞ্জয় মহাপাত্র।

এবার কী, ছুটি ভোগ? মহাপাত্র জিজ্ঞেস করলেন।

সেই রকমই তো বাসনা, বলল ফেলুদা। কে খুন হল?

স্থানীয় লোক নয় বলেই তো মনে হচ্ছে। নাম দেখছি রূপচাঁদ সিং।

কীসে পেলেন?

ড্রাইভিং লাইসেন্স।

কোথাকার?

নেপাল।

পুরু চশমা পরা একজন বাঙালি ভদ্রলোক পুলিশের ফোটাগ্রাফারকে ঠেলে সরিয়ে এগিয়ে এসে বললেন, আমি লোকটাকে দেখেছি। কাল বিকেলে স্বর্গদ্বার রোডে একটা চায়ের দোকানের বাইরে বসে চা খাচ্ছিল। আমি পান। কিনছিলাম পাশের দোকান থেকে; লোকটা আমার কাছ থেকে দেশলাই চেয়ে নিয়ে সিগারেট ধরায়।

মরল কীভাবে? ফেলুদা মহাপাত্রকে জিজ্ঞেস করল।

রিভলভার বলেই তো মনে হচ্ছে। তবে ওয়েপন পাওয়া যায়নি। এইটে দেখতে পারেন, লাইসেনসের ভিতর গোঁজা ছিল।

ভদ্রলোক একটা মাঝারি সাইজের ভিজিটিং কার্ড ফেলুদার দিকে এগিয়ে দিলেন। একদিকে কাঠমাণ্ডুর একটা দরজির দোকানের নাম-ঠিকানা, অন্যদিকে বেশ কাঁচা হাতে

ইংরিজিতে লেখা—এ. কে. সরকার, ১৪ মেহের আলি রোড, ক্যালকাটা। বানান ভুলগুলোর কথা আর বললাম না।

ফেলুদা কার্ডটা ফেরত দিয়ে বলল, ইন্টারেস্টিং ফ্যাকরা যদি বেরোয় তো জানাবেন। আমরা নীলাচল হোটেলে আছি।

আমরা লাশ পিছনে ফেলে এগিয়ে গেলাম।

কাল যে বাড়িটাকে দেখে আমরা তারিফ না করে পারিনি, আজ মেঘলা দিনে সেটা যেন মেদা মেরে গেছে, ভেতরে যাবার জন্য আর হাতছানি দিয়ে ডাকছে না।

গেটের বাইরে একজন লোক দাঁড়িয়ে, বয়স পচিশের বেশি না, দেখলে মনে হয়। চাকর, সে আমাদের দিকে এগিয়ে এসে বলল, মিত্রবাবু?

ফেলুদা এগিয়ে গেল। —আমিই মিত্রবাবু?

আসুন ভিতরে।

বাগানটাকে দুভাগে চিরে একটা নুড়ি-ফেলা পথ বারান্দার দিকে চলে গেছে। দেখলাম সেটা আমাদের পথ নয়। তিনতলায় যেতে হলে বাড়ির বাঁ পাশ দিয়ে গলির মধ্য দিয়ে যেতে হয়, কারণ তিন তলার দরজা আর সিড়ি বাড়ির পিছন দিকে। গলির মাঝামাঝি এসে লালমোহনবাবু হঠাৎ হিক শব্দ করে তিন হাত পিছিয়ে গিয়েছিলেন, তার কারণ মাটিতে পড়ে থাকা একটা সরু লম্বা সাদা কাগজের ফালি। লালমোহনবাবু সেটাকে সাপ মনে করেছিলেন।

সিঁড়ির সামনে গিয়ে চাকর আমাদের ছেড়ে দিল, কারণ ওপর থেকে একটি ভদ্রলোক নেমে এসেছেন।

মিস্টার মিত্র? আসুন আমার সঙ্গে।

ফেলুদাকে চিনেছেন নাকি? মুখের হাসি তো তাই বলছে। ভদ্রলোকের চোখে মাইন্যাস পাওয়ারের চশমা, গায়ের চামড়া বলছে বয়স পয়ত্রিশের বেশি নয়, কিন্তু মাথার চুল এর মধ্যেই বেশ পাতলা হয়ে গেছে।

আপনার পরিচয়টা? সিঁড়ি উঠতে উঠতে জিজ্ঞেস করল ফেলুদা।

আমার নাম নিশীথ বোস। আমি দুর্গবাবুর সেক্রেটারি।

দুর্গবাবু? ওঁর নাম তা হলে–

দুগার্গতি সেন। এখানে সবাই ডি. জি. সেনই বলে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে ডাইনে একটা ঘর, বোধহয় সেটাতেই সেক্রেটারি থাকেন, কারণ একটা তক্তপোশের পাশে একটা ছোট্ট টেবিলের উপর একটা টাইপরাইটার চোখে পড়ল। বাঁয়ে একটা প্যাসেজের দুদিকে দুটো ঘর, শেষ মাথায় ছাত। সেই ছাতেই যেতে হল আমাদের।

মাঝারি ছাত, একপাশে একটা কাচের ঘরের মধ্যে কিছু অর্কিড। ছাতের মাঝখানে একটা বেতের চেয়ারে বসে আছেন একটি বছর ষাটেকের ভদ্রলোক। লালমোহনবাবু পরে যে বলেছিলেন ব্যক্তিত্ব উইথ এ ক্যাপিটাল বি, সেটা খুব ভুল বলেননি। টকটকে রং, ভাসা ভাসা চোখ, কাঁচা-পাকা মেলানো ফ্রেঞ্চকটি দাড়ি আর মুগুর ভাঁজা চওড়া কাঁধ। চেয়ারে বসেই নমস্কার করছেন দেখে প্রথমে একটু কেমন-কেমন লাগছিল, তারপর কারণটা বুঝলাম। নীল প্যান্টের তলা দিয়ে ভদ্রলোকের বা পায়ের যেটুকু দেখা যাচ্ছে, সবটুকুই। ব্যান্ডোজে ঢাকা।

আমাদের জন্য আরও তিনটে চেয়ার বার করে রাখা হয়েছে; আমরা বসলে পর ফেলুদা বলল, আপনি যে আমাদের সময় দিয়েছেন তার জন্য আমরা সত্যিই কৃতজ্ঞ। আপনি পুরনো পুঁথি সংগ্রহ করেন শুনে আসার লোভ সামলাতে পারলাম না।

ওটা আমার অনেক'দিনের শখ। –আমাদের দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে কথাটা বললেন ভদ্রলোক। চেহারার সঙ্গে মানানসই গলার স্বর।

ফেলুদা বলল, আমার এক জ্যাঠামশাই আছেন, নাম সিদ্ধেশ্বর বোস, তাঁর তিনটে পুথি আছে। আপনি বোধহয় একবার সেগুলো দেখতে গিয়েছিলেন।

কী পুঁথি?

তিনটেই বাংলা। দুটো অন্নদামঙ্গল, আর একটা গোরক্ষাবিজয়।

তা গিয়ে থাকতে পারি। পুঁথির পেছনে ঘুরেছি অনেক।

আপনার কি সব বাংলা পুঁথি?

অন্য ভাষাও আছে। যেটা বেস্ট সেটা সংস্কৃত।

কবেকার পুঁথি?

টুয়েলফথ সেঞ্চুরি।

আমি মনে মনে বললাম, জিনিসটা যদি আমাদের দেখার ইচ্ছেও থাকে, বলে কোনও লাভ হবে না। ভদ্রলোকের মার্জি হলে দেখাবেন, না তো নয়।

লোকনাথ!

বুঝলাম চাকরের নাম লোকনাথ। কিন্তু তাকে হঠাৎ ডাকা কেন?

চাকরের বদলে মুহূর্তের মধ্যে চলে এলেন নিশীথবাবু। পদার বাইরেই দাঁড়িয়েছিলেন কি?

লোকনাথ নেই, স্যার। বেরিয়েছে। কিছু বলবেন কি?

মিঃ সেন ডান হাতটা বাড়িয়ে দিলেন। নিশীথবাবু সেটা ধরে ভদ্রলোককে চেয়ার থেকে উঠতে সাহায্য করলেন।

আসুন।

ভদ্রলোকের পিছন পিছন আমরা ছাত থেকে প্যাসেজ ও প্যাসেজ থেকে শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকলাম।

বেশ বড় ঘর, বাঁয়ে একটা প্রকাণ্ড খাট, যাকে ইংরিজিতে বলে ফোর-পোস্টার। খাটের পাশে একটা কাশ্মীরি টেবিলে একটা ল্যাম্প, দুটো ওষুধের শিশি আর একটা কাচের গেলাস। ডাইনে একটা মাঝারি সাইজের রোলটিপ ডেস্ক, একটা চেয়ার, আর দেয়ালে লাগানো পাশাপাশি দুটো গোদরেজের আলমারি।

খোলো।

হুকুমটা হল সেক্রেটারিকে। নিশীথবাবু খাটের উপর রাখা বালিশের তলা হাতড়িয়ে একটা চাবির গোছা বার করে ডেস্কের ঠিক পাশের আলমারিটা খুললেন।

ভিতরে চারটে শেলফ। তার প্রত্যেকটাতে পাশাপাশি থরে থরে সাজানো শালুতে মোড়া লম্বা লম্বা প্যাকেট। সব মিলিয়ে আনন্দাজ চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশটা।

এতেও আছে কিছু, অন্য আলমারিটা দেখিয়ে বললেন দুগার্গতি সেন। –তবে আসলটা–

আসলটা বেরোল শেলফ থেকে নয়, নীচের দিকের একটা দেরাজ থেকে। লক্ষ করলাম তার নীচে আরেকটা পুঁথি রয়েছে।

নিশীথবাবু হুকুম পেয়ে শালুর উপর ফিতের বাঁধনটা খুলে ফেললেন। ভিতর থেকে বেরিয়ে এল দুদিকে কাঠের পটার মধ্যিখানে স্যান্ডউইচ করা দ্বাদশ শতাব্দীর সংস্কৃত পুঁথি।

অষ্টাদশসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা, বললেন দুগার্গতি সেন,-অন্যটা কল্পসূত্র।

কাঠের পটার উপরে আশ্চর্য সুন্দর রঙিন ছবি, এতদিনের পুরনো হওয়া সত্ত্বেও রঙের জৌলুস কমেনি। পুঁথিটা কাগজের নয়, তালপাতার। হাতের লেখা যে এত পরিপাটি আর এত সুন্দর হতে পারে তা আমার ধারণাই ছিল না। লালমোহনবাবু চাপা গলায় মন্তব্য করলেন, ধন্যি ছেলের অধ্যবসায়।

ফেলুদা বলল, এটা কোথায় পেলেন জানতে পারি কি?

ধরমশালা, বললেন ভদ্রলোক।

তার মানে কি এ জিনিস তিব্বত থেকে দালাই লামার সঙ্গে এসেছিল?

হ্যাঁ।

ভদ্রলোক পুথিটা ফেলুদার হাত থেকে নিয়ে নিশীথবাবুকে দিয়ে দিলেন। সেটা আবার ফিতে বাঁধা অবস্থায় যেখানে ছিল সেখানে চলে গেল।

আপনি কি আপনার জ্যাঠার হয়ে সুপারিশ করতে এসেছেন?

প্রশ্নটা শুনে বেশ হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। ফেলুদা কিন্তু নানান বেয়াড়া প্রশ্নের সামনে পড়েও নিজেকে দিব্যি ঠাণ্ডা রাখতে পারে। বলল, আজ্ঞে না।

আমি এসব জিনিস নিয়ে ব্যবসা করি না, বললেন মিঃ সেন, কেউ যদি দেখতে চায় তো দেখাতে পারি—এই পর্যন্ত।

আমার জ্যাঠার সামর্থ্য নেই। এ জিনিস কেনার, হেসে বলল ফেলুদা।অবিশ্যি আমার কোনও ধারণা নেই এর কত দাম হতে পারে।

অমূল্য।

কিন্তু এসবও তো দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে?

চামার। যারা বিক্রি করে তারা চামার।

আপনার ছেলের এ সবে ইন্টারেস্ট নেই?

দুগাগতিবাবু কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন প্রশ্নটা শুনে। খাটের পাশের টেবিলটার দিকে চেয়ে কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে বললেন, ছেলেকে আমি চিনি না।

স্যার, ইনি একজন বিখ্যাত গোয়েন্দা, স্যার।

নিশীথবাবু হঠাৎ এই সময় এই কথাটা কেন বললেন বুঝলাম না। দুর্গাগতিবাবু একবার ফেলুদার মুখের দিকে চেয়ে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিলে বললেন, তাতে ভয়ের কী? আমি কি খুন করেছি?

শ্যামলালবাবু ঠিকই বলেছিলেন। ভদ্রলোকের হাবভাব কথাবাতা সত্যিই পিকিউলিয়ার। অবিশ্যি এর পরের কথাটা আরও তাজ্জব, প্রায় একেবারে হেঁয়ালির মতো। –

যা হারিয়েছে, তা ফিরিয়ে আনা গোয়েন্দার কম্মো নয়। যে পারে। সেই করছে চেষ্টা, বন্ধ দরজা খুলছে একে একে। গোয়েন্দার কিছু করার নেই।

পনেরো মিনিট হয়ে গেছে, তাই ফেলুদা দরজার দিকে ফিরল। নিশীথবাবু যেন একটু ব্যস্ত হয়ে বললেন, আসুন। আমরা পুঁথির মালিককে ধন্যবাদ জানিয়ে নীচে রওনা দিলাম।

ভদ্রলোকের পায়ে কী ব্যাপার? ফেলুদা নীচে নামতে নামতে প্রশ্ন করল।

ওঁকে গাউটে ধরেছে। গোটে বাত, বললেন নিশীথবাবু, খুব শক্ত-সমর্থ লোক ছিলেন আগে। এই মাস তিনেক হল কাহিল হয়ে পড়েছেন।

যে ওষুধগুলো দেখলাম সে কি গাউটের?

আজ্ঞে হ্যাঁ। কেবল একটা ঘুমের ওষুধ। লক্ষ্মণবাবুর দেওয়া।

গণৎকার লক্ষ্মণ ভট্টাচার্যি? প্রশ্ন করলেন লালমোহনবাবু।

আজ্ঞে হ্যাঁ। উনি অ্যালোপ্যাথি আয়ুর্বেদ দুটোই বেশ ভাল জানেন। বেশ কোয়ালিফয়েড লোক। অনেক কিছু জানেন।

বটে? কর্তার সঙ্গে মাঝে মাঝে পুঁথি নিয়েও কথাবার্তা বলতে শুনিচি।

আশ্চর্য লোক! বললেন জটায়ু।

ফেলুদার ভুরুটা যে কেন কুঁচকে রয়েছে সেটা বুঝতে পারলাম না।

৪. লক্ষ্মণ ভট্টাচার্য

লালমোহনবাবুর ইচ্ছে ছিল লক্ষ্মণ ভট্টাচার্যের সঙ্গে ফেলুদার আলাপ করিয়ে দেবেন, কিন্তু সেটা আর হল না, কারণ গণংকারের দরজায় তালা। আমরা সাগরিক থেকে বেরিয়ে হোটেলমুখে হলাম। সমুদ্রের ধারে ভিড় হয়ে গেছে এই পনেরো মিনিটের মধ্যেই, কারণ মেঘ পাতলা হয়ে গিয়ে সূর্যটা উঁকি মারব মারব্য করছে। ডাইনে রেলওয়ে হোটেলটা দেখা যাচ্ছে, ফেলুদা বলল। এই ভিড়ের বেশির ভাগ লোকই নাকি ওই হোটেলের। আমরা ভিড় ছাড়িয়ে কয়েক পা যেতেই পিছন থেকে অচেনা গলায় ডাক এল।

মিস্টার মিত্তির।

অন্যদের থেকে একটু আলগা হয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে একজন লম্বা ভদ্রলোক ফেলুদার দিকে চেয়ে হাসছেন। বোঝা যাচ্ছে ইনি বেশ কয়েক' দিন সমুদ্রতটে ঘোরাফেরা করেছেন, কারণ সানগ্লাসটা খুলতেই চোখ থেকে কান অবধি একটা ফিকে লাইন দেখা গেল যেখানে চশমার ডাঁটিটা চামড়ায় রোদ লাগতে দেয়নি।

ভদ্রলোক আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন। প্রায় ফেলুদার মতোই লম্বা, সুপুরুষ বলা চলে, কালো চাপ দাড়ি আর গোঁফটা বেশ হিসেব করে ছাঁটা, কালো ট্রাউজারের ওপর চিজক্লথের শার্টটা হাওয়ায় সেঁটে আছে শরীরের সঙ্গে।

আপনার নাম শুনেছি, বললেন ভদ্রলোক।এসেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন নাকি?

কেন বলুন তো?

একটা খুন হয়েছে শুনলাম যে। তাই ভাবলাম আপনি আবার জড়িয়ে পড়লেন কি কাঁ।

ফেলুদা হেসে বলল, খুন হলেই জড়িয়ে পড়তে ইচ্ছে হয় ঠিকই, কিন্তু কেউ না ডাকলে আর কী করে যাই বলুন।

আপনি তো নীলাচলে উঠেছেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

হোটেলে ফিরছেন?

হ্যাঁ।

ইয়ে–

ভদ্রলোক কী যেন বলতে গিয়ে ইতস্তত করছেন। ফেলুদা বলল, আপনাকে বুঝি আংটি সামলাতে হচ্ছে?

এটা আমি আগেই লক্ষ করেছি। ভদ্রলোক ডান হাতের তেলোয় তিনটে সোনার আংটি নিয়ে রয়েছেন, ফলে বেশ বোকা বোকা দেখাচ্ছে।

আর বলবেন না, বললেন ভদ্রলোক, আমাদের হোটেলের এক বাসিন্দা, কালই আলাপ হয়েছে, জলে নামবেন, তা বললেন এগুলো নাকি আঙুল থেকে খুলে আসে। বলুন তো কী ঝক্কি।

আংটির মালিক যে কে সে আর বলতে হবে না। ওই যে, নুলিয়ার হাত ধরে ছপ ছপ করে এগিয়ে আসছেন তিনি। সোনায় মোড় মিঃ হিঙ্গোরানি। ফেলুদাকে দেখে ভদ্রলোক গুড মর্নিং বলে একটা হাঁক দিলেন, তারপর আরও এগিয়ে এসে থ্যাঙ্ক ইউ বলে আংটিগুলো ফেরত নিয়ে আঙুলে পরে জানিয়ে দিলেন যে গোয়া, ওয়াইকিকি, মায়ামি, আকাপুলকো, নিস ইত্যাদি অনেক জায়গার সমুদ্রতটের অভিজ্ঞতা আছে তাঁর, কিন্তু পুরীর মতো বিচ নাকি কোথাও নেই।

নতুন ভদ্রলোকটি এবার হিঙ্গোরানির কাছে বিদায় নিয়ে আমাদের সঙ্গ নিলেন। ফেলুদা বলল, আপনার নামটা কিন্তু এখনও জানা হয়নি।

ভদ্রলোক মৃদু হেসে বললেন, আমার নাম বললে হয়তো চিনবেন না, একটা বিশেষ লাইনে আমার কিছুটা কনট্রিবিউশন আছে, তবে সেটা সকলের জানার কথা নয়। আমার নাম বিলাস মজুমদার।

ফেলুদা ভুরু কুঁচকে ভদ্রলাকের দিকে চাইল। –আপনার কি পাহাড়-টাহাড়ের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক আছে?

ভদ্রলোক অবাক। ––বাবা, আপনার জ্ঞানের পরিধি দেখছি–

না, না, ফেলুদা বিলাসবাবুর কথা শেষ করতে দিল না– তেমন কিছু নয়। গত মাসখানেকের মধ্যে কোথায় যেন বিলাস মজুমদার নামটা দেখেছি–বাধহয় কোনও পত্রিকায় বা খবরের কাগজে। মনে হচ্ছে তাতে মাউনটেনিয়ারিং বা ওই জাতীয় কিছুর উল্লেখ ছিল।

ঠিকই দেখেছেন। আমি মাউনটেনিয়ারিং শিখেছিলাম দার্জিলিং-এর ইনস্টিটিউটে। আমার আসল কাজ হচ্ছে ওয়াইলড-লাইফ ফোটাগ্রাফি। একটা জাপানি দলের সঙ্গে স্নো-লেপার্ডের ছবি তুলতে যাবার কথা ছিল। জানেন বোধহয়–হিমালয়ের হাই অলটিচিউডে মো-লোপার্ডের আস্তানা! দেখেছে। অনেকেই, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনও ছবি তোলা সম্ভব হয়নি জানোয়ারটার।

পথে আর কোনও কথা হল না। লালমোহনবাবু বার বার সপ্রশংস দৃষ্টিতে ভদ্রলোকের দিকে দেখছেন সেটা লক্ষ করেছি।

হোটেলে ফিরে এসেই ফেলুদা চায়ের অর্ডার দিল। ভদ্রলোক চেয়ারে বসে প্রথমেই পকেট থেকে একটা ছবি বার করে আমাদের দিকে এগিয়ে দিলেন।

দেখুন তো একে চেনেন কি না।

পোস্টকার্ড সাইজের ছবি। মাটিতে উবু হয়ে বসা চ্যাপটা টুপি পরা একটা লোক একটা অদ্ভুত জানোয়ারকে জাপটে ধরে আছে, আর আট-দশজন লোক সেই জানোয়ারটাকে দেখছে। মিঃ মজুমদার যে লোকটির দিকে আঙুল দেখাচ্ছেন তাঁকে আমরা চিনি।

এঁর কাছ থেকেই তো আসছি। আমরা, বলল ফেলুদা, যদিও চিনতে একটু সময় লাগে, কারণ ভদ্রলোক দাড়ি রেখেছেন।

মিঃ মজুমদার ছবিটা ফেরত নিয়ে বললেন, এইটেই জানার দরকার ছিল। বাড়ির গেটে ডি. জি. সেন নাম দেখলাম, কিন্তু তিনি এই ছবির ডি. জি. সেন কি না সে বিষয়ে শিওর হতে পারছিলাম না।

জানোয়ারটি প্যাঙ্গোলিন বলে মনে হচ্ছে! বলল ফেলুদা।

ঠিক তো!—ওই প্যাঙ্গোলিন নামটা কিছুতেই মনে পড়ছিল না। একরকম পিপীলিকাভুক। দেখে মনে হয় গায়ে বর্ম পরে রয়েছে।

বিলাসবাবু বললেন, প্যাঙ্গোলিনই বটে। নেপালে পাওয়া যায়। কাঠমাণ্ডুর এক হোটেলের বাইরে তোলা। ডি. জি.সেন ছিলেন তখন ওই হোটেলে। আমিও ছিলাম।

এটা কবেকার ঘটনা?

গত অক্টোবরে। আমি গেছি সেই জাপানি টিম আসবে বলে। জাপানের কাগজেও আমার তোলা ছবি-টবি বেরিয়েছে। জাপানি দলটা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে। স্বভাবতই আমি খুব উৎসাহিত হয়ে পড়ি। কিন্তু শেষ অবধি আর যাওয়া হয়নি।

কেন, কেন? ব্যস্ত হয়ে প্রশ্ন করলেন জটায়ু! বুঝলাম লেপার্ড-টেপার্ড শুনে ভদ্রলোক একটা রোমাঞ্চের গন্ধ পেয়েছেন।

কপাল। বললেন মিঃ মজুমদার। একটা অ্যাক্সিডেন্টে জখম হয়ে হাসপাতালে পড়ে ছিলাম তিন মাস।

আপনার বাঁ পা কি জখম পা? হঠাৎ প্রশ্ন করল ফেলুদা।

কেন বলুন তো? বা পায়ের শিন বোনটা ভেঙেছিল বটে; কিন্তু আমার হাঁটা দেখলে কি বোঝা যায়?

তা যায় না, বলল ফেলুদা, কাল একটা পায়ের ছাপ দেখেছিলাম বালিতে-জুতো-পরা পা, সঙ্গে-সঙ্গে বাঁ পাশে লাঠির ছাপ। ভাবলাম, হয় ন্যাটা, না হয় বাঁ পায়ে জখম। তা আপনি লাঠি ব্যবহার করেন না দেখছি।

মাঝে মাঝে করি, বললেন বিলাস মজুমদার, কারণ বালিতে হাঁটতে কষ্ট হয়। কিন্তু উনচল্লিশ বছর বয়সে হাতে লাঠি ধরতে ইচ্ছে করে না।

তা হলে অন্য কেউ হবে।

অবিশ্যি শিন বান ভাঙাই একমাত্র ইনজুরি নয়। পাহাড়ের গা দিয়ে পাঁচশো ফুট গড়িয়ে পড়েছিলাম। একটা গাছের উপর পাড়ি তাই জখমটা তরু কম হয়। এক চাষার ছেলে কয়েকজন হিপিকে খবর দেয়, তারাই আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। শিন বোন ছাড়া সাতটা পাঁজরার হাড় আর কলার বোন ভেঙেছিল। থুতনি থেতলে গিয়েছিল; দাড়ি রেখেছি ক্ষতচিহ্ন ঢাকবার জন্য। দুদিন পরে জ্ঞান হয়। স্মৃতিশক্তি তছনছ হয়ে গিয়েছিল। ডায়রি থেকে নাম ঠিকানা বার করে কলকাতার বাড়িতে খবর দেয়। এক ভাইপো চলে আসে। তাকে চিনতে পারিনি। হাসপাতালে থাকতেই কিছুটা স্মৃতি ফিরে আসে। চিকিৎসার ফলে আরও খানিকটা ইমপ্রুভ করেছে, কিন্তু অ্যাক্সিডেন্টের ঠিক আগের ঘটনা এখনও ঠিক মনে পড়েনি। যেমন, ডি. জি. সেন বলে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, সেটা আমার ডায়রিতে পাচ্ছি কিন্তু তার চেহারাটা মনে পড়েছে মাত্র দুদিন আগে।

ডি. জি. সেন কেন গিয়েছিল কাঠমাণ্ডু, সেটা মনে পড়ছে? ফেলুদা জিজ্ঞেস করল—পুথি সংক্রান্ত কোনও ব্যাপার কি?

পুঁতি? একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন ভদ্রলোক। —যা দিয়ে মালা গাঁথে?

না, ফেলুদা হেসে বলল। —পুথি বা পুঁথি। পুস্তিকা। হাতে লেখা প্রাচীন বই। ভদ্রলোকের খুব ভাল কালেকশন আছে পুঁথির।

ও, তাই বলুন।

ভদ্রলোক চুপ করে কী যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, কী রকম দেখতে হয় বলুন তো এই পুঁথি?

সরু, লম্বা, চ্যাপটা, বলল ফেলুদা। – ধরুন স্টেট এক্সপ্রেসের একটা কার্টনের সাইজ। তার চেয়ে একটু ছাট বা বড়ও হতে পারে। সাধারণত শালুতে মোড়া থাকে।

ভদ্রলোক আবার কিছুক্ষণ চুপ। একদৃষ্টি চেয়ে আছেন টেবিল ল্যাম্পটার দিকে, আর আমরা চেয়ে আছি ভদ্রলোকের দিকে।

বেশ মিনিটখানেক পরে বিলাস মজুমদার বললেন, তা হলে বলি শুনুন। কাঠমাণ্ডুতে যে হোটেলে ছিলাম, বিক্রম হোটেল, সেখানে ভারী এক অদ্ভুত ব্যাপার ছিল। দু-একটা ঘর ছিল যার চাবি অন্য ঘরে লেগে যেত—যেটা হোটেলে কখনওই হবার কথা না। এক'দিন আমি আমার ঘরের চাবি নিয়ে ভুল করে আমার পাশের ঘরের দরজায় লাগিয়ে ঘোরাতেই দরজা খুলে গেল। সেটা ছিল ডি. জি. সেন-এর ঘর। প্রথমে ঠিক ধরতে পারিনি। ভাবছি আমার ঘরে এরা কারা, ঢুকল কী করে। আসল ব্যাপারটা বুঝতেই সারি বলে বেরিয়ে আসি, কিন্তু ততক্ষণে একটা ঘটনা আমি দেখে ফেলেছি। খাটে বসে আছেন মিঃ সেন, আর চেয়ারে দুটি অচেনা লোক, তাদের একজন একটা কার্ডবোর্ডের বাক্স থেকে একটি

প্যাকেট বার করছে। যতদূর মনে পড়ে প্যাকেটটা ছিল। লাল, তবে সেটা কাগজ কি কাপড় তা মনে নেই।

তারপর? ফেলুদা প্রশ্ন করল।

তারপর ব্ল্যাঙ্ক। অনেক চেষ্টা করেও মনে করতে পারিনি। এর পরের মেমরি হচ্ছে হাসপাতালে জ্ঞান হওয়া।

লালমোহনবাবু হঠাৎ ভীষণ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন—আরে মশাই, এমন ভাল গণৎকার রয়েছেন এই পুরীতে, আপনি তাঁর কাছে যান না একবারটি। যা ভুলে গেছেন, সব ডিটেলে বলে দেবেন।

কার কথা বলছেন?

লক্ষ্মণ ভট্টাচার্য দি গ্রেট। ওই ডি. জি. সেনেরই বাড়ির এক তলার ভাড়াটে। যদি দ্বিধা হয় তো বলুন, আমি অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে আমিই আপনাকে নিয়ে যাব। আপনি একটিবার ট্রায়াল দিয়ে দেখুন।

বলছেন?

ভদ্রলোকের যেন আইডিয়াটা ভালই লেগেছে।

একশোবার! বললেন লালমোহনবাবু—আপনার কপালে ওই আঁচলটার উপর আঙুল রেখে সব গড়গড় করে বলে দেবেন।

এটা এতক্ষণ বলা হয়নি—বিলাসবাবুর কপালের ঠিক মাঝখানে একটা আচিল, হঠাৎ দেখলে মনে হবে ভদ্রলোক বুঝি টিপ পরেছেন।

ভদ্রলোক কি ভিজিটর অ্যালাউ করেন? ফেলুদা প্রশ্ন করল।

হোয়াই নট? বললেন লালমোহনবাবু।আপনি আর তপেশ যাবেন তো? সে আমি ওঁকে বলে রাখব, কোনও চিন্তা নেই।

ঠিক হল, আজই সন্ধ্যা ছটায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা হবে। ভদ্রলোকের ফি পাঁচ টাকা পঁচাত্তর শুনে বিলাসবাবু হেসেই ফেলেছিলেন। কিন্তু ফেলুদা হিসেব করে দেখিয়ে দিল দশজন খদ্দের হলেও ভদ্রলোকের মাসিক আয় হয়ে যায় প্রায় দু হাজার টাকা।

আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম যে নিজের ভাগ্য গণনা করাবার ইচ্ছে না থাকলেও, বিলাস মজুমদারের স্মৃতি উদ্ধার হয় কি না দেখার জন্য ফেলুদার যথেষ্ট কৌতুহল রয়েছে।

৫. মন্দিরের দিকটা

আজ ঠিকই করে রেখেছিলাম যে বিকেলে একটু মন্দিরের দিকটায় যাব। মন্দিরের চেয়েও রথটা দেখার ইচ্ছে বেশি। ফেলুদার কাছেই শুনলাম যে এই বিশাল রথ নাকি প্রতিবারই রথযাত্রার পর ভেঙে ফেলা হয়। আর তার কাঠ দিয়ে খেলনা তৈরি করে বাজারে বিক্রি করা হয়। পরের বছর আবার ঠিক একই রকম নতুন রথ তৈরি হয়।

যাবার পথে ফেলুদাকে কেন যেন অন্যমনস্ক মনে হচ্ছিল। হয়তো এই দুদিনে নতুন আলাপীদের সঙ্গে যে সব কথাবাতা হয়েছে, সেগুলো ওর মাথায় ঘুরছিল। একটা কথা ওকে না বলে পারলাম না–

আচ্ছা ফেলুদা, নেপালটা কীরকম বারবার এসে পড়ছে, তাই না? যে লোকটা খুন হল সে নেপালের লোক, বিলাসবাবু কাঠমাণ্ডু গিয়েছিলেন, দুর্গাগতিবাবু ঠিক সেই সময় কাঠমাণ্ডুতে ছিলেন…

তুই কি এতে কোনও তাৎপর্য খুঁজে পেলি?

না। তবে–

সমপাত মানে জানিস?

না তো।

সমপাত হল ইংরিজিতে যাকে বলে কেইনসিডেন্স। যতক্ষণ না আরও এভিডেন্স পাওয়া যাচ্ছে, ততক্ষণ কাঠমাণ্ডুর ব্যাপারটা একটা কোইনসিডেন্স বলে ধরতে হবে–বুঝলি?

বুঝেছি।

পুরীর বিখ্যাত রথ দেখে মন্দিরের সামনে বিশাল চওড়া রাস্তার একপাশে দোকানগুলোয় ঘুরে ঘুরে পাথরের তৈরি খুদে খুদে মূর্তি, কোনারকের চাকা, এইসব দেখছি, এমন সময় সাব-ইনস্পেক্টর মৃত্যুঞ্জয় মহাপাত্রের আবির্ভাব। হঠাৎ চিনতে পারিনি, কারণ এই ফাঁকে কখন জানি চুল ছেটে এসেছেন। আমাদের এক দূর সম্পর্কের কাকা আছেন, যিনি হেয়ার কাটিং সেলুনে চেয়ারে বসলেই ঘুমিয়ে পড়েন; ফলে নাপিত বেহিসাবি কিছু করলে টের পান না। ঘুম ভাঙার পর অবিশ্যি প্রতিবারই কুরুক্ষেত্র বেধে যায়। মহাপাত্রকে দেখে মনে হল এনারিও সে বাতিক আছে।

ফেলুদা ভদ্রলোককে দেখে জিজ্ঞেস করল, তদন্ত এগোল? মেহেরালি রোডের মিস্টার সরকার কী বলেন?

ইনফরমেশন এসেছে আজি আড়াইটেয় বললেন মহাপাত্র।চোদ্দো নম্বর মেহেরালি রোড হল একটা ফ্ল্যাট বাড়ি! সবসুদ্ধ আটটা ফ্ল্যাট, সরকার থাকেন তিন নম্বরে। দিন সাতেক হল ওঁর ঘর তালাবন্ধ। প্রায়ই নাকি বাইরে যান।

এবার কোথায় গেছেন জানতে পারলেন?

পুরী।

বটে? কে বলল?

চার নম্বরের বাসিন্দা। তাকে নাকি বলেছে চেঞ্জে যাচ্ছে।

চেহারা কেমন জানতে পারলেন?

লম্বা, মাঝারি রং, দাড়ি-গোঁফ নেই, বয়স পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ। এ ধরনের বর্ণনার অবিশ্যি কোনও মূল্য নেই।

পেশা?

বলে ট্র্যাভেলিং সেলসম্যান। কী সেল করে তা কেউ জানে না। বছর খানেক হল ওই ফ্ল্যাটে এসেছে।

আর রূপচাঁদ সিং?

সে এখানে এসেছে গতকাল সকালে। বাসস্ট্যান্ডের কাছে একটা হোটেলে ছিল। ভাড়া চুকোয়নি। কাল রাত্রে নাকি একটা ফোন করতে চেয়েছিল হোটেল থেকে, ফোন খারাপ ছিল। শেষে একটা ডাক্তারি দাকান থেকে কাজ সারে। কম্পাউন্ডার পাশেই দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু খদ্দের ছিল বলে কী কথা হয়েছে তা শোনেনি! এগারোটা নাগাদ হোটেল থেকে বেরোয়। আর ফেরেনি। ঘরে একটা সুটকেস পাওয়া গেছে, তাতে জামা-কাপড় রয়েছে কিছু। দুটো টেরিলিনের শার্ট দেখে মনে হয় লোকটা বেশ শৌখিন ছিল।

সেটা কিছুই আশ্চর্য না, বলল ফেলুদা, আজকাল ড্রাইভারের মাইনে আপিসের কেরানির চেয়ে অনেক বেশি।

কথাই ছিল রেলওয়ে হোটেল থেকে বিলাসবাবুকে আমরা তুলে নেব; ছটা বাজতে পনেরো মিনিটে আমরা হোটেলে গিয়ে হাজির হলাম। ব্রিটিশ আমলের হোটেল, এখন রং ফেরানো হলেও চেহারায় পুরনো যুগের ছাপটা রয়ে গেছে। সামনে বাগান, সেখানে রঙিন ছাতার তলায় বেতের চেয়ারে বসে হোটেলের বাসিন্দারা চা খাচ্ছে। তারই একটা থেকে উঠে পাশের চেয়ারে বসা দুজন সাহেবকে এক্সকিউজ মি বলে বিলাসবাবু আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন।

চলুন, কপালে কী আছে দেখা যাক?

আজ লালমোহনবাবু আমাদের গাইড, তাই তাঁর হাবভাব একেবারে পালটে গেছে। দিব্যি গটগটিয়ে সাগরিকার গেট দিয়ে ঢুকে বাগানের মধ্যিখানের নুড়ি ফেলা পথ দিয়ে সটান গিয়ে বারান্দায় উঠে কাউকে না দেখে একটু থতমত খেয়ে তৎক্ষণাৎ আবার নিজেকে সামলে নিয়ে সাহেবি মেজাজে কোই হ্যায় বলতেই বাঁ দিকে একটা দরজা খুলে গেল।

স্বাগতম!

বুঝলাম ইনিই লক্ষ্মণ ভট্টাচার্য। পরনে সিল্কের লুঙ্গি আর চিকনের কাজ করা সাদা আদ্দির পাঞ্জাবি। মাঝারি হাইটের চেহারার বিশেষত্ব হল সরু গোঁফটা, যেটা ঠোঁটের দুপাশ দিয়ে প্রায় আধা ইঞ্চি নেমে এসেছে নীচের দিকে।

লালমোহনবাবু আলাপ করাতে যাচ্ছিলেন, ভদ্রলোক বাধা দিয়ে বললেন, ওটা ভিতরে গিয়ে হবে। আসুন।

লক্ষ্মণ ভট্টাচার্যের বৈঠকখানার বেশির ভাগটা দখল করে আছে একটা তক্তপোশ; বুঝলাম ওটার উপরে বসেই ভাগ্যগণনা হয়। এ ছাড়া আছে দুটো কাঠের চেয়ার, একটা মোড়া, একটা নিচু টেবিলের উপর ওড়িশা হ্যাঁন্ডিক্রাফটসের একটা অ্যাশট্রে, আর পিছনে একটা দেয়ালের আলমারিতে দুটো কাঠের বাক্স, কিছু বই, কিছু শিশি-বোতল-বয়াম ইত্যাদি ওষুধ রাখার পাত্র, আর একটা ওয়েস্ট এন্ড অ্যালার্ম ঘড়ি।

আপনি বসুন। এইখেনটায়–তক্তপোশের একটা অংশ দেখিয়ে বিলাসবাবুকে বললেন গণৎকার। –আর আপনারা এইখেনে।

চেয়ার আর মোড়া দখল হয়ে গেল।

লালমোহনবাবু এইবারে আমাদের সঙ্গে আলাপটা করিয়ে দিলেন। ফেলুদার বিষয় বললেন, ইনিই আমার সেই বন্ধু, আর বিলাস মজুমদারের নামটা বলে ইনি হচ্ছেন বিখ্যাত ওয়াই–বলেই জিভ কেটে চুপ করে গেলেন। আমি জানি উনি বলতে গিয়েছিলেন ওয়াইল্ড লাইফ ফোটাগ্রাফার; নিজের বুদ্ধিতেই যে নিজেকে সামলে নিয়েছেন সেটা আশ্চর্য বলতে হবে।

ফেলুদা বোধহয় কেলেঙ্কারিটা চাপা দেবার জন্যই বলল, আমরা দুজন অতিরিক্ত লোক এসে পড়েছি বলে আশা করি আপনি বিরক্ত হননি।

মোটেই না বললেন লক্ষ্মণ ভট্টাচার্য। –আমার আপত্তি যেটাতে সেটা হচ্ছে স্টেজে উঠে ডিমনস্ট্রেশন দেওয়ায়। সে অনুরোধ অনেকেই করেছে। আমি যে যাদুকর নই সেটা অনেকেই বিশ্বাস করতে চায় না। এই যেমন-

ভদ্রলোকের কথা থেমে গেল। তাঁর দৃষ্টি চলে গেছে বিলাস মজুমদারের দিকে। –কী আশ্চর্য! বললেন লক্ষ্মণ ভট্টাচার্য্য–আপনার কপালে ঠিক থার্ড আই-এর জায়গায় দেখছি একটি উপমাংস!

উপমাংস মানে যে আঁচিল সেটা জানতাম না।

ঠিক ওইখানে খুলির আবরণের তলায় কী থাকে জানেন তো? ভদ্রলোক ফেলুদার দিকে চেয়ে প্রশ্নটা করলেন।

পিনিয়াল গ্ল্যান্ডের কথা বলছেন? ফেলুদা বলল।

হ্যাঁ–পিনিয়াল গ্ল্যান্ড। মানুষের মগজের সবচেয়ে রহস্যময় অংশ। অন্তত পশ্চিমের বৈজ্ঞানিকরা তাই বলেন। আমরা যদিও জানি যে ওটা আসলে প্রমাণ করে যে আদিম যুগে প্রাণীদের তিনটি করে চোখ ছিল, দুটি নয়। ওই থার্ড আইটাই এখন হয়ে গেছে পিনিয়াল গ্ল্যান্ড। নিউগিনিতে একরকম সরীসৃপ আছে, নাম টারটুয়া, যার মধ্যে এখনও এই থার্ড আই দেখতে পাওয়া যায়।

ফেলুদা বলল, আপনার কপালে আঙুল রাখার উদ্দেশ্য কি এই পিনিয়াল গ্ল্যান্ডের সঙ্গে যোগস্থাপন করা?

তা একরকম তাই বলতে পারেন? বললেন লক্ষ্মণ ভট্টাচার্য। –অবিশ্যি যখন প্রথম শুরু করি। তখন পিনিয়াল গ্ল্যান্ডের নামও শুনিনি। জগবন্ধু ইনস্টিটিউশনে ক্লাস সেভেনে পড়ি তখন। এক রবিবার আমার জ্যাঠামশাইয়ের মাথা ধরল। বললেন, লখনা, আমার মাথাটা একটু টিপে দিবি? আমি তোকে আইসক্রিমের পয়সা দেব। কপাল টনটন করছে,

কপালের মধ্যিখানে বুড়ো আঙুল আর তর্জনী দিয়ে টিপছি, এমন সময় অদ্ভুত একটা ব্যাপার হল। চোখের সামনে বায়স্কোপের ছবির মতো পরপর দেখতে লাগলাম—জ্যাঠার পৈতে হচ্ছে, জ্যাঠা পুলিশের ভ্যানে উঠছেন—মুখে বন্দেমাতরম স্লোগান, জ্যাঠার বিয়ে, জেঠিমার মৃত্যু, এমনকী জ্যাঠার নিজের মৃত্যু পর্যন্ত, কীসে মরছেন, কোন খাটে শুয়ে মরছেন, খাটের পাশে কে কে রয়েছেন, সব।..তখন কিছু বলিনি, কিন্তু এই মৃত্যুর ব্যাপারটা যখন অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল, তখন...বুঝতেই পারছেন—

লালমোহনবাবুকে দেখে বেশ বুঝছিলাম যে ওঁর গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠেছে। বিলাসবাবু দেখলাম একদৃষ্টি চেয়ে রয়েছেন গণৎকারের দিকে।

ফেলুদা বলল, আপনি তো শুনেছি। ডাক্তারিও করেন, আর তার চিহ্নও দেখছি ঘরে। নিজেকে কী বলেন—ডাক্তার, না গণৎকার?

দেখুন, গণনার ব্যাপারটা আমি শিখিনি। আয়ুর্বেদটা শিখেছি। অ্যালোপ্যাথিও যে একেবারে জানি না তা নয়। পেশা কী জিজ্ঞেস করলে ডাক্তারিই বলব। আসুন, এগিয়ে আসুন, কাছে এসে বসুন।

শেষের কথাগুলো অবিশ্যি বিলাসবাবুকে বলা হল। ভদ্রলোক এগিয়ে এসে তক্তপোশে পা তুলে বাবু হয়ে বসে বললেন, দেখুন, কপালের ব্ল্যাক স্পটটি যদি ইনফরমেশনের সহায়ক হয়।

লক্ষ্মণবাবুর পাশেই যে একটা ছোট্ট অ্যালুমিনিয়ামের বাটি রাখা ছিল সেটা এতক্ষণ লক্ষ করিনি। তার মধ্যে তরল পদার্থটা যে কী তা জানি না, কিন্তু দেখলাম লক্ষ্মণবাবু তাতে ডান হাতের কড়ে আঙুলের ডগাটা তিনবার চুবিয়ে নিলেন। তারপর একটা ধবধবে পরিষ্কার রুমালে আঙুলটা মুছে নিয়ে চোখ বুজে মাথা হেঁট করে আঙুলের ডগাটা মোক্ষম আন্দাজে ঠিক বিলাসবাবুর কপালের আচিলের উপর বসিয়ে দিলেন!

তারপর মিনিটখানেক সব চুপ। সবাই চুপ। কেবল ঘড়ির টিকটিক আর—এই প্রথম খেয়াল হল—বাইরে থেকে আসা একটানা ঢেউ ভাঙার শব্দ।

তেত্রিশ—তেত্রিশ—উনিশ শো তেত্রিশ—তুলা লগ্ন, সিংহ রাশি-পিতামাতার প্রথম সন্তান...

লক্ষ্মণ ভট্টাচার্য চোখ বন্ধ করেই বলতে শুরু করেছেন।

সাড়ে আটে টনসিল অ্যাডিনয়েডস— পরীক্ষায় বৃত্তি— স্বর্ণপদক...বিজ্ঞান— পদার্থ বিজ্ঞান— উনিশে গ্র্যাজুয়েট— তেইশ উপার্জন শুরু— চাক...না, চাকরি না— ফ্রিল্যান্স— ফটোগ্রাফার— স্ট্রাগল... স্ট্রাগল দেখছি, স্ট্রাগল— উদ্যম, একাগ্রতা, অধ্যবসায়— পর্বতারোহণে পটুতা— বন্যপশুপক্ষী-প্রীতি— বেপরোয়া জীবন— ভ্রাম্যমাণ— অকৃতদার...

ভদ্রলোক একটু থামলেন। ফেলুদা গভীর মনোযোগের সঙ্গে ওড়িশা হ্যাঁন্ডিক্রাফটসের অ্যাশট্রেটা দেখছে। লালমোহনবাবু হাতদুটো মুঠো করে টান হয়ে বসেছেন। আমার বুক টিপ টিপ করছে। বিলাসবাবুর মুখ দেখলে কিছু বোঝার উপায় নেই, তবে ওঁর চোখ যে গণৎকারের দিক থেকে একবারও সরেনি, সেটা আমি লক্ষ করেছি।

সেভেনটি এইট—সেভেনটি এইট...

আবার কথা শুরু হয়েছে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। বেশ স্ট্রেন হচ্ছে ভদ্রলোকের সেটা বোঝা যায়।

বন দেখছি, বন—হিমালয়—অপঘাত—অপ— না—

পাঁচ সেকেন্ড চুপ থেকে ভদ্রলোক হঠাৎ বিলাসবাবুর কপাল থেকে আঙুল নামিয়ে নিয়ে চোখ খুললেন। তারপর সটান বিলাসবাবুর দিকে চেয়ে বললেন, আপনার বেঁচে থাকার কথা নয়, কিন্তু রাখে হরি মারে কে?

অ্যাক্সিডোন্ট নয়? বিলাসবাবু ধরা গলায় প্রশ্ন করলেন।

লক্ষ্মণ ভট্টাচার্য মাথা নেড়ে পকেট থেকে পানের ডিবে বার করে একটা পান মুখে পুরে বললেন, যতদূর দেখছি, নট অ্যাক্সিডেন্ট! আপনাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়া হয়েছিল পাহাড়ের প্রান্ত থেকে। অর্থাৎ, ডেলিবারেট অ্যাটেম্পট মাডার। মরেননি সেটা আপনার পরম ভাগ্যি।

কিন্তু কে ঠেলিল সেটা—?

প্রশ্নটা করেছেন লালমোহনবাবু। লক্ষ্মণ ভট্টাচার্য মাথা নাড়লেন। —স্যারি। যা দেখেছি তার বাইরে বলতে পারব না। বললে মিথ্যে বলা হবে। দেবতা। রুষ্ট হবেন।

দিন আপনার হাতটা।

বিলাসবাবু করমর্দনের জন্য তাঁর ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়েছেন লক্ষ্মণ ভট্টাচার্যের দিকে।

৬. ফাইভ স্টার না সিক্স স্টার

এটাকে কী বলবেন? ফাইভ স্টার না সিক্স স্টার? লালমোহনবাবুকে প্রশ্নটা করল ফেলুদা।

আমরা রেলওয়ে হোটেলে এসেছি ডিনার খেতে। বিলাসবাবু সাগরিকা থেকে বেরিয়েই আমাদের নেমন্তন্ন করলেন। বললেন, আপনারা আমার অশেষ উপকার করেছেন; আমার এই অনুরোধটা রাখতেই হবে।

রেলওয়ে হোটেলের খাওয়া যে অপূর্ব তাতে কোনও সন্দেহ নেই। আর সেটা লালমোহনবাবুও না। স্বীকার করে পারলেন না। বললেন, রেলের খাওয়ার যা ছিরি হয়েছে আজকাল মশাই, আমি ভাবলুম রেলওয়ে হোটেলের খাওয়াও বুঝি সেই স্ট্যান্ডার্ডের হবে। সে ভুল ভেঙে গেছে—থ্যাঙ্কস টু ইউ।

বিলাসবাবু হেসে বললেন, এবার সুফ্‌লেটা খেয়ে দেখুন।

কী খাব সুপ প্লেটে? সুপ তো গোড়াতেই খেলুম।

সূপ প্লেট নয়। সুফ্‌লে-মিষ্টি।

এই সুফলে খেতেই বিলাসবাবু লক্ষ্মণ ভট্টাচার্যের দৌলতে মনে পড়ে যাওয়া ঘটনাটা বললেন। –

মিস্টার সেনের ঘরে দেখা সেই ঘটনাটা আমার মনে কোনওরকম খটকার সৃষ্টি করেনি। পরদিন ভদ্রলোক পোখরা যাচ্ছিলেন; আমাকে সঙ্গে যাবার জন্য ইনভাইট করলেন। জাপানি দল আসতে আরও তিনদিন দেরি, তাই রাজি হয়ে গেলুম। পোখরা কাঠমাণ্ডু থেকে প্রায় দুশো কিলোমিটার। পথে একটা জঙ্গল পড়ল, ভদ্রলোক সেখানে গাড়ি থামাতে বললেন। বললেন নাকি ভাল আর্কিড পাওয়া যায় ওই জঙ্গলে। আমিও ক্যামেরা নিয়ে

নামলুম। আর কিছু না হাক, এক-আধটা ভাল পাখিও যদি পাই, তা হলেই বা মন্দ কী?—আমি পাখি খুঁজছি, উনি আর্কিড। দুজনে ভাগ হয়ে গেছি, কথা আছে আধা ঘণ্টা বাদে দুজনেই গাড়িতে ফিরব। ওপরে গাছের দিকে চোখ রেখে এগোচ্ছি, এমন সময় পিছন। থেকে মাথায় একটা বাড়ি, আর তারপরেই অন্ধকার।

ভদ্রলোক থামলেন। আর কিছু বলার নেই, কারণ বাকি ঘটনা উনি আগেই বলেছেন। ফেলুদা বলল, আঘাতটা কে মেরেছিল সেটা সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিত নন?

বিলাসবাবু মাথা নাড়লেন। —একেবারেই না, তবে এটা বলতে পারি যে সেই জঙ্গলে ত্রিসীমানার মধ্যে আর কোনও মানুষ চোখে পড়েনি। গাড়িটা ছিল মেন রোডে, প্রায় কিলোমিটার খানেক দূরে।

তা হলে অ্যাটেম্পটেড ম্যাডারটা যে মিঃ সেনের কীর্তি, আদালতে সেটা প্রমাণ করার কোনও উপায় নেই?

আজ্ঞে না, তা নেই।

লালমোহনবাবু কিছুক্ষণ থেকেই উসখুসি করছিলেন, এবার বুঝলাম কেন। ভদ্রলোক বললেন, আপনি একবারটি সেনমশাইয়ের সামনে গিয়ে হাজির হন না। উনিই যদি কালপ্রিট হন, তা হলে আপনাকে দেখে বেশ একটা ভূত দেখার মতো ব্যাপার হতে পারে। সেটা মন্দ হবে কি?

সে কথা আমি ভেবেছি, কিন্তু সেখানে একটা মুশকিল আছে। উনি আমাকে নাও চিনতে পারেন। কারণ আমার তখন দাড়ি ছিল না। এটা রেখেছি। থুতনির ক্ষতচিহ্নটা ঢাকবার জন্য।

আরও মিনিট পাঁচেক থেকে বিলাসবাবুকে ধন্যবাদ দিয়ে আমরা উঠে পড়লাম। ভদ্রলোক আমাদের গেট অবধি পৌঁছে দিলেন। মেঘ কেটে গেছে, গুমোট ভাবাটাও আর নেই।

ফেলুদার পকেটে একটা ছোট্ট জোরালো টর্চ আছে জানি, কিন্তু ফিকে চাঁদের আলো থাকার দরুন সেটা আর জ্বালাবার দরকার হবে না।

রাস্তা পেরিয়ে সমুদ্রের ধার অবধি বাঁধানো পথটা দিয়ে চলতে চলতে লালমোহনবাবু বললেন, এবার ফ্র্যাঙ্কলি বলুন তো মশাই, কী রকম দেখলেন লক্ষ্মণ ভট্টাচার্যিকে। তাজ্জব ব্যাপার নয় কি?

না। বিলাস মজুমদারকে দুর্গাগতি সেনই হত্যা করার চেষ্টা করেছিল কি না সেটা জানতে হলে ফেলুমিত্তির ছাড়া গতি নেই।

আপনি তদন্ত করছেন তা হলে?

চাঁদের আলোতেই বুঝলাম লালমোহনবাবুর চোখ ঝিলিক দিয়ে উঠেছে।

ফেলুদা কী উত্তর দিত। জানি না, কারণ ঠিক তখনই সামনে একজন চেনা লোককে দেখে আমাদের কথা থেমে গেল। মাটির দিকে চেয়ে আপন মনে বিড়বিড় করতে করতে ব্যস্তভাবে এগিয়ে আসছেন। আমাদেরই পথ ধরে মিঃ হিঙ্গোরানি।

ভদ্রলোক আমাদের দেখে থমকে দাঁড়ালেন; তারপর ফেলুদার দিকে আঙুল নেড়ে বেশ ঝাঁজের সঙ্গে বললেন, ইউ বেঙ্গলিজ আর ভেরি স্টাবর্ন, ভেরি স্টাবর্ন!

হঠাৎ এই আক্রোশ কেন? ফেলুদা হালকা হেসে ইংরিজিতে প্রশ্ন করল। ভদ্রলোক বললেন, আই অফার্‌ড হিম টোয়েন্টি ফাইভ থাউজ্যাণ্ড, অ্যান্ড হি স্টিল সেড নো!

পঁচিশ হাজারের লোভ সামলাতে পারে এমন লোক তা হলে আছে বিশ্বসংসারে?

আরে মশাই, ভদ্রলোক যে পুথি সংগ্রহ করেন সেটা আগে জানতাম। তাই অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে দেখা করতে গেলাম। বললাম তোমার সবচেয়ে ভালুয়েবল পিস কী আছে সেটা দেখাও। তৎক্ষণাৎ আলমারি খুলে দেখালেন—দ্বাদশ শতাব্দীর সংস্কৃত পুঁথি। অসাধারণ

জিনিস। চোরাই মাল কি না জানি না। আমার তো মনে হয়। গত বছর ভাতগাঁওয়ের প্যালেস মিউজিয়াম থেকে তিনটে পুঁথি চুরি গিয়েছিল, এটা তারই একটা। দুটো উদ্ধার হয়েছিল, একটা হয়নি। আর সেটাও ছিল প্রজ্ঞাপারমিতার পুঁথি।

হায়ার ইজ ভাতগাঁও? জিজ্ঞেস করলেন লালমোহনবাবু। জায়গাটার নাম আমিও শুনিনি।

কাঠমাণ্ডু থেকে দশ কিলোমিটার। প্রাচীন শহর, আগে নাম ছিল ভক্তপুর।

কিন্তু চোরাই মাল কি কেউ চট করে দেখায়? ফেলুদা জিজ্ঞেস করল—আর আমি যতদূর জানি প্রজ্ঞাপারমিতার পুঁথি একটা নয়, বিস্তর আছে।

আই নো, আই নো, অসহিষ্ণুভাবে বললেন মিঃ হিঙ্গোরানি। উনি বললেন এটা দালাই লামার সঙ্গে এসেছিল, উনি নাকি ধরমশালা গিয়ে কিনে এনেছিলেন। কত দিয়ে কিনেছিলেন জানেন? পাঁচশো টাকা। আর আমি দিচ্ছি পঁচিশ হাজার—ভেবে দেখুন!

তার মানে কি বলছেন। পুরী আসাটা আপনার পক্ষে ব্যর্থ হল।

ওয়েল, আই ডোন্ট গিভ আপ সো ইজিলি। মহেশ হিঙ্গোরানিকে তো চেনেন না মিস্টার সেন! ওঁর আরেকটা ভাল পুঁথি আছে, ফিফটিনথ সেনচুরি। আমাকে দেখালেন। আরও দুটো দিন সময় আছে হাতে। দেখা যাক ক'দিন ওর গোঁ টেকে।

ভদ্রলোক সংক্ষেপে গুডিনাইট জানিয়ে গজগজ করতে করতে চলে গেলেন হোটেলের দিকে।

একটু সাসপিশাস্ লাগছে না? লালমোহনবাবু প্রশ্ন করলেন। ফেলুদা বলল, কার বা কীসের কথা বলছেন সেটা না জানলে বলা সম্ভব নয়।

পাঁচশো টাকা দিয়ে কেনা জিনিস পঁচিশ হাজারে ছাড়ছে না?

কেন, মানুষ নির্লোভ হতে পারে এটা আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না? সিধুজ্যাঠা দুর্গাগতিবাবুকে পুঁথি বিক্রি করতে রিফিউজ করেছেন সেটা আপনি জানেন?

কই, সেটা তো মিঃ সেন বললেন না।

সেটা তো আমার কাছে আরও স্যাসপিশাস। ঘটনাটা ঘটেছে মাত্র এক বছর আগে।

আমার মনে হল দুর্গাগতিবাবু শুধু পিকিউলিয়ার নন, বেশ রহস্যজনক চরিত্র। আর বিলাসবাবু যা বলছেন তা যদি সত্যি হয়...

সাসিপিশন কিন্তু একজনের উপর পড়ে নেই বলল ফেলুদা, নিউক্লিয়ার ফল-আউটের মতো চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। কাকে বাদ দেবেন বলুন। আপনার গণৎকার যে তৃতীয়-চক্ষু-সম্পন্ন সরীসৃপের কথা বললেন, সেটার নাম টারটুয়া নয়, টুয়াটারা। আর তার বাসস্থান নিউ গিনি নয়, নিউজিল্যান্ড। এ ধরনের ভুল জটায়ুর পক্ষে অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু লক্ষ্মণ ভট্টাচার্য যদি তাঁর জ্ঞানের পরিচয় দিয়ে লোককে ইমপ্রেস করতে চান, তা হলে তাঁকে আরও অ্যাকুরেট হতে হবে। তারপর ধরুন নিশীথবাবু। আড়িপাতার অভ্যাস আছে ভদ্রলোকের; সেটা মোটেই ভাল নয়। তারপর দুর্গাগতিবাবু বললেন ওঁর গাউট হয়েছে কিন্তু ওঁর টেবিলের ওষুধগুলো গাউটের নয়।

তবে কীসের?

একটা ওষুধ তো সবে গত বছর বেরিয়েছে, টাইম ম্যাগাজিনে পড়ছিলাম ওটার কথা। কীসের ওষুধ ঠিক মনে পড়ছে না, কিন্তু গাউটের নয়।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা, ভদ্রলোককে এত অন্যমনস্ক কেন মনে হয় বলে তো? আর তা ছাড়া বললেন, ওঁর ছেলেকে চেনেন না...

সেটারও তো কারণ ঠিক বুঝতে পারছি না।

লালমোহনবাবু বললেন, ধরুন যদি উনি সত্যিই বিলাস মজুমদারকে খুব করার চেষ্টা করে থাকেন, তা হলে সেটাই একটা অন্যমনস্কতার কারণ হতে পারে। এখানে অবিশ্যি অন্যমনস্কতা ইজ ইকুয়াল টু নার্ভাসনেস।

এখানে আমাদের কথা থেমে গেল। শুধু কথা না, হাঁটাও।

বালির উপরে জুতোর ছাপ, আর তার সঙ্গে সঙ্গে বা পাশে লাঠির ছাপ।

ছাপটা হয়েছে গত কয়েক ঘণ্টার মধ্যে।

কিন্তু কথা হচ্ছে এই যে বিলাসবাবু লক্ষ্মণ ভট্টাচার্যের বাড়ি থেকে সোজা হোটেলে ফিরে গিয়ে স্নান-টান সেরে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তিনি এর মধ্যে আর নীচে আসেননি।

তা হলে এ ছাপ কার?

আর কে বাঁ হাতে লাঠি নিয়ে হেঁটে বেড়ায় পুরীর বিচে?

৭. লালমোহনবাবুর গাড়ি

পরদিন সকালে আমরা চা খেয়ে বেরোব বেরোবি ভাবছি, এমন সময় লালমোহনবাবুর গাড়ি চলে এল। ড্রাইভার হরিপদবাবু বললেন যে যদিও সকাল সকাল রওনা হয়েছিলেন, বাল্যাসোরের ৩০ কিলোমিটার আগে নাকি প্রচণ্ড বৃষ্টি নামে, ফলে ওঁকে ঘণ্টা চারেক বাল্যাসোরেই থাকতে হয়েছিল। গাড়ি নাকি দিব্যি এসেছে, কোনও ট্রাবল দেয়নি।

হরিপদবাবুর জন্য আমাদের হোটেলের কাছেই নিউ হোটেলে একটা ঘর বুক করে রাখা হয়েছিল, কারণ নীলাচলে জায়গা ছিল না। গাড়িটা নীলাচলে রেখে ভদ্রলোক চলে গেলেন নিজের হোটেলে। আমরা বলে দিলাম দিন ভাল থাকলে দুপুরের দিকে ভুবনেশ্বরটা সেরে আসতে পারি। একটার মধ্যে মন্দির-টন্দির সব দেখে ঘুরে আসা যায়।

ফেলুদা বলেই রেখেছিল। সকালে একবার স্টেশনে যাবে। ওর আবার স্টেটসম্যান না পড়লে চলে না, হোটেলে দেয় শুধু বাংলা কাগজ।

হাঁটা পথে হোটেল থেকে স্টেশনে যেতে লাগে আধা ঘণ্টা। আমরা যখন পৌঁছলাম তখন পৌনে নটা। কলকাতা থেকে জগন্নাথ এক্সপ্রেস এসে গেছে সাতটায়; পুরী এক্সপ্রেস এক ঘণ্টা লেট, এই এল বলে। কোথাও যাবার না থাকলেও স্টেশনে আসতে দারুণ লাগে। বিশেষ করে কোনও বড় ট্রেন আসামাত্র ঠাণ্ডা স্টেশন কী রকম টগবগিয়ে ফুটে ওঠে, সে জিনিস দেখে দেখেও পুরনো হয় না।

বুক-স্টলে গিয়ে লালমোহনবাবু প্রথমেই জিজ্ঞেস করলেন বিখ্যাত রহস্যরোমাঞ্চ ঔপন্যাসিক জটায়ুর কোনও বই আছে কি না। এটা করার কোনও মানে হয় না, কারণ ওই সিরিজের গোটা দশেক বই সামনেই রাখা রয়েছে, আর তার মধ্যে তিনটে যে জটায়ুর সেটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

ফেলুদা খবরের কাগজ কিনে অন্য বই ঘাঁটছে, এমন সময় একটা গলা পেলাম।

জ্যৈষ্ঠের রহস্য মাসিকটা এসেছে?

পাশ ফিরে দেখি নিশীথবাবু। ভদ্রলোক প্রথমে আমাদের দেখেননি; চোখ পড়তেই কান অবধি হেসে ফেললেন।

দেখুন। পাশে গোয়েন্দা দাঁড়িয়ে, আর আমি কিনছি রহস্য মাসিক!

আপনার বস-এর কী খবর? ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

আর বলবেন না, বললেন নিশীথবাবু, অ্যাপয়েন্টমেন্ট না করে লোক চলে আসে, আর দেখা করার জন্য ঝুলো বুলি করে। পুঁথির এত সমঝদার আছে জানতুম না মশাই।

আবার কে এল?

লম্বা, চাপ দাড়ি, চোখে কালো চশমা। নাম জানতে চাইলে বললেন নাম বললে চিনবেন। না তোমার মনিব। বলে ভাল পুঁথির খবর আছে। বললুম কতর্গকে, বললেন নিয়ে এসো। ছাতে নিয়ে গিয়ে বসালুম। আরও কিছু চিঠি টাইপ করার ছিল, ঘরে চলে গেছি, ও মা, তিন মিনিটের মধ্যেই হাঁকড়াক। গিয়ে দেখি কর্তার মুখ ফ্যাকাসে, এই বুঝি হার্ট ফেল করবেন। বললেন এঁকে নিয়ে যাও। ভদ্রলোককে তৎক্ষণাৎ নিয়ে চলে এলুম। সে আবার যাবার সময় বলে কী, তোমার মানিবের হার্টের ব্যামো আছে নিশ্চয়ই, ডাক্তণর দেখাও!

এখন কেমন আছেন উনি?

এখন অনেকটা ভাল। ভদ্রলোক প্ল্যাটফর্মের ঘড়িটার দিকে দৃষ্টি দিয়েই আঁতকে উঠেছেন–এত যে লেট হয়ে গেছে সেটা খেয়ালই করিনি। শুনুন মশাই আছেন তো ক'দিন? এক'দিন সব বলব। সে অনেক ব্যাপার। আ–চ্ছা!

ইতিমধ্যে পুরী এক্সপ্রেস এসে পড়েছিল, গার্ডের হুইসেলের সঙ্গে সঙ্গে ট্রেন ছেড়ে দিল, আর নিশীথবাবুও ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেলেন।

ফেলুদা একটা চটি বই দেখে রেখেছিল, সেটা কিনে নিল। দাম সতেরো পঞ্চাশ। নাম– এ গাইড টু নেপাল।

ফেরার পথে ফেলুদা বলল, আপনারা বরং আজই ভুবনেশ্বরটা দেখে আসুন। একটা ফিলিং হচ্ছে, আমার এখানে থাকা দরকার। এখুনি কিছু হবে বলে মনে হয় না, তবে আবহাওয়া সুবিধের নয়। তা ছাড়া আমার কিছু কাজও আছে। কাঠমাণ্ডুতে একটা ফোন করা দরকারী! তথ্যগুলো জট পাকিয়ে যাবার আগে একটু গুছিয়ে ফেলা দরকার।

আমি ফেলুদার এই মুডটা ভাল করে জানি। ও এখন গুটিয়ে নেবে নিজেকে, মীনী হয়ে যাবে!! খাটে চিত হয়ে শুয়ে শূন্যে চেয়ে থাকবে। আমি লক্ষ করেছি। এই অবস্থায় ওর প্রায় তিন-চার মিনিট ধরে চোখের পাতা পড়ে না। আমরা যদি এ সময়ে ঘরে থাকি তো ফিসফিস করে কথা বলি। সবচেয়ে ভাল হয় ঘরে না থাকলে। আর ফেলুদার সঙ্গই যদি না পাই তো ভুবনেশ্বরে যেতে ক্ষতি কী?

আমি লালমোহনবাবুকে ইশারায় বুঝিয়ে দিলাম যে আমাদের যাওয়াই উচিত।

হোটেলের কাছাকাছি। যখন পৌঁছেছি। তখন দেখি একজন চেনা লোক গেট দিয়ে বেরোচ্ছেন।

দেখেছেন, আর এক মিনিট এদিক-ওদিক হলেই আর দেখা হত না, বললেন বিলাস মজুমদার।

চলুন ওপরে।

বিলাসবাবু আমাদের ঘরে এসে চেয়ারে বসে কপালের ঘাম মুছলেন।

আপনি তো আমার অ্যাডভাইস নিয়েছেন শুনলাম, একগাল হেসে বললেন লালমোহনবাবু।

শুধু তাই না, বললেন ভদ্রলোক, আপনি ঠিক যেমনটি বলেছিলেন একেবারে হুবহু তাই। যাকে বলে ভূত দেখা। আমি তো অপ্রস্তুতেই পড়ে গোস্লাম মশাই। দাড়ি সত্ত্বেও লোকটা চিনে ফেলল!

ফেলুদা বলল, আপনি বোধহয় খেয়াল করেননি যে আপনার চেহারায় একটি বিশেষত্ব আছে যেটা চট করে ভোলবার নয়।

বিলাসবাবু একটু অবাক হয়ে বললেন, কী বলুন তো?

আপনার কপালে থার্ড আই বলল ফেলুদা।

ঠিক বলেছেন। ওটা আমার খেয়ালই হয়নি। যাকগে, একটা আশ্চর্য ব্যাপার হল, জানেন। লোকটার দশা দেখে ওর ওপর মায়া হল। আর, ওই ঘটনাটার ফলেই বোধহয়, ওঁকে কাঠমাণ্ডুতে যেমন দেখেছিলাম তেমন আর উনি নেই। এই ছয়-সাত মাসে বয়স যেন বেড়ে গেছে দশ বছর। আজ দেখা করে খুব ভাল হল। এবার ঘটনাটা মন থেকে মুছে ফেলতে কোনও অসুবিধা হবে না।

এটা সুখবর, বলল ফেলুদা-শুধু অনুমানের ওপর ভিত্তি করে আপনি বেশি দূর এগোতেও পারতেন না।

ভদ্রলোক উঠে পড়লেন।

আপনাদের প্ল্যান কী?

ফেলুদা বলল, এঁরা দুজন যাচ্ছেন ভুবনেশ্বর, সন্ধ্যায় ফিরবেন। আমি এখানেই আছি।

যাবার আগে গুডবাই করে যাব।

আমাদের বেরোতে বেরোতে সাড়ে বারোটা হলেও, দিনটা ভাল থাকায়, আর চমৎকার রাস্তায় হরিপদবাবু স্পিডোমিটারের কাঁটা। ৮০ কিলোমিটারের নীচে নামতে না দেওয়ার দরুন আমরা ঠিক বেয়াল্লিশ মিনিটে ভুবনেশ্বর পৌঁছে গেলাম।

আমরা প্রথমে চলে গেলাম রাজারানি মন্দির দেখতে, কারণ এরই গায়ের একটা যক্ষীর মাথা চুরি হয়ে গিয়েছিল, আর ফেলুদা তার আশ্চর্য গোয়েন্দাগিরির ফলে সেটা উদ্ধার করে দিয়েছিল। সেটাকে মন্দিরের গায়ে চিনতে পেরে শিরদাঁড়ায় এমন একটা শিহরন খেলে গোল যে বলতে পারি না।

অবিশ্যি মন্দির তো শুধু ওই একটাই নয়-লিঙ্গরাজ, কেদারগৌরী, মুক্তেশ্বর, ব্রহ্মেশ্বর,

দেখা চাই, কারণ এথিনিয়াম ইনস্টিটিউশনের সেই কবি-শিক্ষক বৈকুণ্ঠনাথ মল্লিকের নাকি চার লাইনের একটা গ্রেট পোয়েম আছে ভুবনেশ্বর নিয়ে, যেটা ওঁকে হান্ট করে। মুক্তেশ্বরের চাতালে দাঁড়িয়ে প্রায় চল্লিশ জন দেশি-বিদেশি টুরিস্টের সামনে উনি সেটা গলা ছেড়ে আবৃত্তি করলেন-।

‘কত শত অজ্ঞাত মাইকেল এঞ্জেলো
একদা এই ভারতবর্ষে ছেলো-
নীরবে ঘোষিছে তাহা ভাস্কর্যে ভাস্বর
ভুবনেশ্বর!’

ভদ্রলোক যাতে কষ্ট না পান। তাই আমি মুখে বাঃ বললাম, যদিও এঞ্জেলোর সঙ্গে মিল দেবার জন্য ছিলকে ছেলো করাটা আমার মোটেই গ্রেট পোয়েটের লক্ষণ বলে মনে হল না। কথাটা নরম করে ওঁকে বলতে ভদ্রলোক রেগেই গেলেন।

পোয়েটের ব্যাকগ্রাউন্ড না জেনে ভার্স ক্রিটিসাইজ করার বদ অভ্যাসটা কোথায় পেলে, তপেশ? বৈকুণ্ঠ মল্লিক চুচড়োর লোক ছিলেন। ওখানে ছিলকে ছেলই বলে। ওতে ভুল নেই।

ভুবনেশ্বর ছিমছাম শহর তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু আমার মতে, সমুদ্র না থাকায় পুরীর পাশে দাঁড়াতে পারে না। কাজেই সাতটা নাগাদ আবার নীলাচল হোটেলে ফিরে আসতে দিব্যি ভাল লাগল।

তিন ধাপ সিড়ি দিয়ে হোটেলের বারান্দায় উঠতেই ম্যানেজার শ্যামলাল বারিক তাঁর ঘর থেকে হাঁক দিলেন।

ও মশাই, মেসেজ আছে।

আমরা হন্তদন্ত হয়ে ঢুকলাম তাঁর ঘরে।

মিত্তির মশাই এই দশ মিনিট হল বেরোলেন। বললেন। আপনারা যেন ঘরেই থাকেন।

কী ব্যাপার? কোথায় গেলেন?

থানা থেকে ফোন করেছিল ওঁকে। ডি. জি. সেনের বাড়িতে চুরি হয়েছে। একটি মহামূল্য পুঁথি।

আশ্চর্য! ফেলুদার মন বলছিল কিছু একটা হবে, আর সত্যিই হয়ে গেল।

৮. স্নান করে চা খেয়ে

স্নান করে চা খেয়ে শরীরের ক্লান্তি দূর হল ঠিকই। কিন্তু মন ছটফট, বুকের ভিতর টিপ টিপ, ফেলুদা তদন্তে লেগে গেছে। পুরী আমাদের হতাশ করেনি।

কিন্তু সেই সঙ্গে এও মনে হচ্ছে, এতে ফেলুদার ট্যাঁকে কিছু আসবে কি? অবিশ্যি কেস তেমন জমাটি হলে রোজগার হল কি না হল সেটা ফেলুদা ভুলে যায়। অনেক সময় রোজগার যেগুলোতে হয়– মানে, যেখানে মক্কেল ঘরে এসে ফেলুদাকে তদন্তের ভার দেয়, সেখানে পকেট ভরলেও মন ভরে না, কারণ রহস্যটা হয় মামুলি। আবার এমন অনেকবার হয়েছে যে ফেলুদা শখ করে তদন্ত করেছে, পয়সা হয়তো কিছুই আসেনি, অথচ রহস্য জটিল হওয়াতে সমাধান করে মন মেজাজ মগজ সব একসঙ্গে চাঙিয়ে উঠেছে।

কাকে সাসপেক্ট করছ, তপেশ? আটটা নগাত প্রশ্ন করলেন লালমোহনবাবু। উনি এতক্ষণ হাত দুটোকে পিছনে জড়ো করে আমাদের ঘরে পায়চারি করেছেন।

আমি বললাম, চুরি করার সুযোগ সবচেয়ে বেশি নিশীথবাবুর, কিন্তু সেইজন্যেই উনি করবেন বলে মনে হয় না। এ ছাড়া হিঙ্গোরানির তো লোভ ছিলই ওই পুঁথির ওপর। বিলাস মজুমদারও টাকা আর প্রতিশোধের জন্য করতে পারেন। তারপর লক্ষ্মণ ভট–

না না না, ভীষণভাবে প্রতিবাদ করে উঠলেন লালমোহনবাবু।এমন একজন লোককে এর মধ্যে টেনো না–প্লিজ। কী অলৌকিক ক্ষমতা ভেবে দেখো তো ভদ্রলোকের।

আপনার কী মনে হয়? আমি পালটা প্রশ্ন করলাম।

আমার মনে হয় তুমি আসল লোকটাকেই বাদ দিয়ে গেলে।

কে?

সেন মশাই হিমসেলফ।

সে কী? উনি নিজের জিনিস চুরি করতে যাবেন কেন?

চুরি নয়, চুরি নয়, পাচার। চোরাই মাল পাচার করলেন অ্যাদিনে। হিঙ্গোরানি হাইয়ার প্রাইস অফার করেছেন, আর উনি বেচে দিয়েছেন। লোককে বলছেন চুরি।

আমি ভেবে দেখছিলাম। লালমোহনবাবুর কথা ঠিক হতে পারে কি না, এমন সময় রুম বয় এসে খবর দিল যে, আমার টেলিফোন আছে। ফেলুদা।

রুদ্ধশ্বাসে নীচে গিয়ে ফোন ধরলাম।

কী ব্যাপার?

শ্যামলালবাবু বলেছেন?

হ্যাঁ। কিন্তু কিছু বুঝতে পারলে?

নিশীথবাবু হাওয়া।

তাই বুঝি? পুলিশে খবর দিল কে?

সে সব গিয়ে বলব। আমি আধা ঘণ্টার মধ্যেই ফিরছি। ভুবনেশ্বর কেমন লাগল?

ভাল। ইয়ে—

ফেলুদা ফোন রেখে দিয়েছে।

লালমোহনবাবুকে বললাম। ভদ্রলোক মাথা চুলকে বললেন, সিন অফ ক্রাইমে একবার গিয়ে পড়তে পারলে ভালই হত, তবে তোমার দাদা বোধহয় চাইছেন না।

আরও এক ঘণ্টা অপেক্ষা করেও যখন ফেলুদা এল না, তখন সত্যিই চিন্তা হতে শুরু করল। রুম-বয়কে বলে আরেক দফা চা আনিয়ে নিলাম। দুজনে পালা করে পায়চারি করছি। ইতিমধ্যে একটা অন্যায় কাজ করে ফেলেছি, কিন্তু না করে পারলাম না। ফেলুদার খাতাটা খাটের উপরই ছিল, তাতে আজ দুপুরে ও কী লিখেছে সেটা দেখে ফেলেছি, যদিও মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝিনি। ওর ধনী ব্যবসায়ী মক্কেল হরিহর জরিওয়ালার দেওয়া ক্রস মার্কা ডট পেনে একটা পাতায় ছড়িয়ে লেখা রয়েছে–

ডায়াবিড?–গাউট–সাপ?–কী ফিরে আসবে? ছেলেকে চেনে না কেন?–-কালোডাক? কাকে? কেন?–লাঠি হাতে কে হাঁটে?...

ন'টা নাগাত ধৈর্য ফুরিয়ে গেল। যা থাকে কপালে বলে দুজন বেরিয়ে পড়লাম। সাগরিক থেকে ফিরতে হলে ফেলুদা সমুদ্রের ধার দিয়ে শর্টকাটই নেবে। আমরা তাই হোটেল থেকে বেরিয়ে ডাইনেই ঘুরলাম।

কালও রাত্রে রেলওয়ে হোটেল থেকে সমুদ্রের ধার ধরে ফিরবার সময় মনে হয়েছে, দিনে আর রাতে কত তফাত। ঢেউয়ের গর্জন যেমন দিনে তেমনি রাত্তিরেও চলে, কিন্তু রাত্রে সমস্ত ব্যাপারটা আবছা অন্ধকারে ঘটে বলে গা ছমছম করে অনেক বেশি। প্রকৃতির কী অদ্ভুত খেয়াল। জলের ফসফরাস না থাকলে এমন মেঘলা রাত্তিরে কি ঢেউগুলো দেখা যেত?

দূরে বাঁয়ে আকাশটা যে ফিকে হয়ে আছে, সেটা শহরের আলোর জন্য। সামনে দূরের টিমটিমে আলোর বিন্দুগুলো নিশ্চয় নুলিয়া বস্তির।

আমরা দুজনে যতটা পারা যায় জল দূরে রেখে বাঁদিক ধরে চলতে লাগলাম। ঢেউয়ের ফেনা আমাদের বিশ-পঁচিশ হাত দূর অবধি গড়িয়ে এসে থেমে যাচ্ছে। লালমোহনবাবুর সঙ্গে টর্চ আছে, কিন্তু অপ্রয়োজনে সেটা ব্যবহার করার কোনও মানে হয় না।

আজ সারাদিন বৃষ্টি না হওয়ায় বালি শুকনা কিন্তু তাও পা বসে যায়। এ বালি দিঘার মতো জমাট নয় যে প্লেন ল্যান্ড করবে। লালমোহনবাবু কেড্‌স। পরেছেন, আর আমি চপ্পল। এই চপ্পলেই হঠাৎ জানি কীসের সঙ্গে ঠোক্কর খেলাম, আর খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুখ থুবড়ে বালিতে। লালমোহনবাবুও কী হল, কী হল করে এগিয়ে এসে কীসে জানি বাধা পেয়ে হুড়মুড়িয়ে পড়ে দুবার হেলপ হেলপূর্ণ বলে বিকট চিৎকার করে উঠলেন। আমি ধরা গলায় বললাম, আমার পেটের নীচে দুটো ঠ্যাং।

বলো কী!

আমরা দুজনেই কোনওরকমে উঠে পড়েছি, লালমোহনবাবু টর্চটা জ্বালাতে চেষ্টা করে পারছেন না বলে সেটার পিছনে থাবড়া মারছেন।

একটা গোঙানির শব্দ, আর তারপর একটা মানুষের শরীর বালি থেকে উঠে বসল। চোখে যত না দেখছি, তার চেয়ে বেশি আন্দাজে বুঝছি।

হাতটা দে–

ফেলুদা!

আমি ডান হাতটা বাড়লাম। ফেলুদা সেটা ধরে এক ঝটিকায় উঠে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ আমার পিঠে হাত রেখে টলল।

টার্চ জ্বলেছে। লালমোহনবাবু কাঁপা হাতে আলোটা ফেলুদার মুখে ফেললেন। ফেলুদা দুঞ্জের ডান হাতটা সাবধানে মাথার উপর রেখে যন্ত্রণায় মুখটা বিকৃত করে হাতটা নামিয়ে নিল।

টর্চের আলোতে দেখলাম হাতের তেলোয় রক্ত।

ফে ফ্‌-ফেটে গেছে? ফাটা গলায় প্রশ্ন করলেন জটায়ু।

কিন্তু ফেলুদার চোখে ভ্রূকুটি। –কী রকম হল?

ফেলুদাকে এত হতভম্ব হতে দেখিনি কখনও। ও নিজের পকেট থেকে ছোট্ট টর্চটা বার করে এদিক ওদিক ফেলল। এক জোড়া জুতো পরা পায়ের ছাপ ফেলুদা যেখানে পড়েছিল তার পাশ থেকে চলে গেছে উঁচু পাড়টার দিকে, যেখানে বালি শেষ হয়ে গেছে।

আমরা এগিয়ে গেলাম পায়ের ছাপ ধরে। পাড় এখানে বুক অবধি উঁচু। উপরে ঘাস আর ঝোপড়া; কাছাকাছির মধ্যে বাড়ি-টাড়ি নেই। যেখানে লোকটা ওপরে উঠে গেছে, সেখানে বালিতে কিছু ঘাসের চাবড়া পড়ে থাকতে দেখে বুঝলাম, লোকটাকে বেশ কসরত করে উঠতে হয়েছে।

ফেলুদা হোটেলমুখে ঘুরল, আমরা তার পিছনে।

আপনি কতক্ষণ এই ভাবে পড়ে ছিলেন বলুন তো? লালমোহনবাবুর গলার স্বর এখনও স্বাভাবিক হয়নি। ফেলুদা রিস্টওয়্যাচের ওপর টর্চ ফেলে বলল, প্রায় আধা ঘণ্টা।

মাথায় তো স্টিচ দিতে হবে মনে হচ্ছে।

না, বলল ফেলুদা। –আমার মাথায় শুধু বাড়ি লেগেছে, জখম হয়নি।

তা হলে রক্ত–?

ফেলুদা কোনও জবাব দিল না।

৯. হোটেলে এসে মাথায় বরফ

হোটেলে এসে মাথায় বরফ দিয়ে ফেলুদার ব্যথাটা কমল। এই কীর্তির জন্য কে দায়ী সে সম্বন্ধে ফেলুদার কোনও ধারণা নেই। সাগরিকা থেকে ফেরার পথে জনমানবশূন্য বিচে হঠাৎ চোখের উপর আচমকা টর্চের আলো, আর তারপরেই মাথায় বাড়ি। ফেলুদা ফোন করে মহাপাত্রকে ঘটনাটা বলায় ভদ্রলোক বললেন, আপনি একটু বুঝে-সুঝে চলুন মশাই। কিছু অত্যন্ত বেপরোয়া লোক যে আশেপাশে ঘোরাফেরা করছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। আপনি চুপচাপ থেকে পুরো ব্যাপারটা আমাদের হ্যান্ডল করতে দিলে সবচেয়ে ভাল হয়। ফেলুদা উত্তরে বলে যে এই ঘটনাটা ঘটবার আগে সেটা বললে ও হয়তো ভেবে দেখতে পারত, এখন টু লেট।

রাত্রে খাওয়া সেরে ঘরে এসেছি, ঘড়িতে বলছে পৌনে এগারোটা, এমন সময় শ্যামলাল বারিক একটি ভদ্রলোককে নিয়ে আমাদের ঘরে ঢুকলেন। বছর চল্লিশেক বয়স, ফরাসা ফিটফট চেহারা, চোখে পুরু কলো ফ্রেমের চশমা। শ্যামলালবাবু বললেন, ইনি আধা ঘণ্টা হল অপেক্ষা করছেন। আপনারা খাচ্ছিলেন, তাই আর ডিসটার্ব করিনি।

ভদ্রলোককে বসিয়ে শ্যামলালবাবু বিদায় নিলেন।

আগন্তুক ফেলুদার দিকে চেয়ে হেসে বললেন, আমি আপনার নাম শুনেছি। ইন ফ্যাক্ট, আপনার কীর্তিকলাপ পড়ার দরুন এঁদের দুজনকেও চিনতে পারছি। আমার নাম মহিম সেন।

ফেলুদার ভুরু কুঁচকে গেল। তার মানে—?

দুর্গাগতি সেন আমার বাবা।

আমরা তিনজনেই চুপ। ভদ্রলোকই কথা বলে চললেন।

আমি এসেছি আজই দুপুরে। মোটরে। আমাদের কোম্পানির একটা গেস্ট হাউস আছে, সেখানে উঠেছি।

আপনার বাবার সঙ্গে দেখা করেননি? ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

ফোন করেছিলাম এসেই। ওঁর সেক্রেটারি ধরেছিলেন। আমি আমার পরিচয় দিলাম। উনি বাবার সঙ্গে কথা বলে জানালেন। বাবা ফোনে আসতে চাইছেন না।

কারণ?

জানি না।

ফেলুদা বলল, আপনার বাবার সঙ্গে কথা বলে আমার ধারণা হয়েছে, তিনি আপনার প্রতি খুব প্রসন্ন নন। কেন, সেটা আপনি অনুমান করতে পারছেন না?

ভদ্রলোক ফেলুদার অফার করা চারমিনার প্রত্যাখ্যান করে নিজের একটা রিথম্যান ধরিয়ে বললেন, দেখুন, বাবার সঙ্গে আমার খুব একটা মেলামেশা কোনওদিনও ছিল না; তাই বলে অসদ্ভাবও ছিল না। আমি ওঁর হবি সম্বন্ধে কোনওদিন বিশেষ ইনটারেস্ট দেখাইনি; আর্টের চোখ আমার নেই। আমি থাকি কলকাতায়; কোম্পানির কাজে বছরে বার-দুয়েক বিদেশে যেতে হয়। চিঠি লিখে সব সময়ই উত্তর পেয়েছি, তা পোস্টকার্ডে দুটো লাইনই হাক। বাবা এখানে আসবার পর দুবার আমি আর আমার স্ত্রী ওঁরই বাড়ির দাতলায় হপ্তা-দুয়েক করে থেকে গেছি। আমার একটি বছর আটেকের ছেলে আছে, তাকে উনি অত্যন্ত স্নেহ করেন। কিন্তু এবার যেটা করলেন সেটা আমার কাছে একেবারে রহস্য। বাবার মতো শক্ত লোকের বাষট্টি বছরে ভীমরতি ধরবে এটা বিশ্বাস করা কঠিন। কোনও তৃতীয় ব্যক্তি এর জন্য দায়ী কি না তাও জানি না। তাই যখন শুনলাম। আপনি এসে রয়েছেন। পুরীতে, ভাবলাম একবার দেখা করে যাই।

আপনার বাবার সেক্রেটারিটি। ক’দিন রয়েছেন?

ত বছর চারেক হবে। আমি সেভেনটি সিক্সে এসে ওঁকে দেখেছি।

কী রকম লোক বলে মনে হয়েছে। আপনার?

আমার পক্ষে বলা শক্ত। এটুকু বলতে পারি যে চিঠি টাইপ করা ইত্যাদি মোটামুটি জানলেও, বাবা ওঁর সঙ্গে কথা বলে নিশ্চয়ই আনন্দ পেতেন না।

তা হলে আপনাকে খবর দিই–আপনার বাবার সংগ্রহের সবচেয়ে মূল্যবান পুঁথিটি আজ চুরি হয়েছে। এবং সেই সঙ্গে সেক্রেটারিও উধাও।

মহিমবাবুর মুখ হাঁ হয়ে গেল।

বলেন কী! আপনি গিয়েছিলেন ওখানে?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

কী রকম দেখলেন বাবাকে?

স্বভাবতই মুহ্যমান। ওঁর দুপুরে ওষুধ খেয়ে ঘুমোনের অভ্যাস হয়েছে আজকাল; আগে ছিল কি না জানি না। আজ বিকেলে সাড়ে ছটায় নাকি একজন আমেরিকান ভদ্রলোকের আসবার কথা ছিল। নিশীথবাবুই অ্যাপয়েন্টমেন্টের ব্যাপারটা দেখেন, কেউ এলে উনিই সঙ্গে করে নিয়ে যান। আজ উনি ছিলেন না। চাকর ছিল, সে-ই সাহেবকে নিয়ে যায় ওপরে। আপনার বাবা সাধারণত সাড়ে চারটের মধ্যে উঠে পড়েন, কিন্তু আজ উঠতে হয়ে গেছিল প্রায় ছটা। যাই হাক, সাহেব পুঁথি দেখতে চায়। মিঃ সেন আলমারির দেরাজ খুলে দেখেন শালুর মোড়ক ঠিকই আছে, কিন্তু তার ভিতরে রয়েছে দুটো কাঠের মাঝখানে ফালি করে কাটা এক গোছা সাদা কাগজ। আপনার বাবা খুবই বিচলিত হয়ে পড়েন, শেষটায়। ওই আমেরিকানই পুলিশে ফোন করেন।

কিন্তু তার মানে নিশীথবাবুই কি–?

তই তো মনে হচ্ছে। ভদ্রলোকের সঙ্গে সকালে স্টেশনে দেখা হয়েছিল। এখন মনে হচ্ছে টিকিট কিনতে গিয়েছিলেন; কারণ ওঁর ঘরে সুটকেস-বেডিং নেই। স্টেশনে গিয়েছিল। পুলিশ, কিন্তু ততক্ষণে পুরী এক্সপ্রেস, হাওড়া প্যাসেঞ্জার দুটোই চলে গেছে। অবিশ্যি ওরা পরের স্টেশনগুলোতে খবর পাঠিয়ে দিয়েছে।

আমরা তিনজনেই চুপ। এর মধ্যে এত ঘটনা ঘটে গেছে শুনে মাথা ভোঁ ভোঁ করছে।

আপনার বাবা গত বছর নেপালে গিয়েছিলেন সে খবর জানেন?

মহিমবাবু বললেন, অগাস্টের পর গিয়ে থাকলে জানার কথা নয়, কারণ আমি তখন থেকে সাত মাস দেশের বাইরে। বাবা পুঁথির খোঁজে। অনেক জায়গায় যেতেন। কেন, নেপালে কী হয়েছিল?

ফেলুদা এ প্রশ্নের কোনও জবাব না দিয়ে বলল, আপনার বাবার গাউট হয়েছে এটাও কি আপনার কাছে নতুন খবর?

মহিমবাবু যেন আকাশ থেকে পড়লেন।

গাউট? বাবার গাউট?

বিশ্বাস করা কঠিন?

খুবই। গত বছর মে মাসেও দেখেছি বাবা ভোরে আর সন্ধ্যায় সমুদ্রের ধারে বালির উপর দিয়ে। হনাহনিয়ে হেঁটে চলেছেন। ওনার খাওয়া-দাওয়া ছিল পরিমিত, ড্রিংক করতেন না, কোনওরকম অনিয়ম করতেন না। স্বাস্থ্য নিয়ে ওঁর একটা অহংকার ছিল। বাবার গাউট হলে খুবই আশ্চর্য হব, এবং খুবই ট্র্যাজিক ব্যাপার হবে।

এটাই কি ওঁর বর্তমান মানসিক অবস্থার কারণ হতে পারে?

তা তা পারেই বেশ জোরের সঙ্গে বললেন মহিমবাবু।নিজেকে পঙ্গু বলে মেনে নেওয়াটা বাবার পক্ষে খুবই কঠিন হবে।

ফেলুদা বলল, আমি রয়েছি আরও কয়েক'দিন। দেখি যদি কিছু করতে পারি। আমার কাছে অনেক কিছুই এখনও পর্যন্ত ধোঁয়াটে।

মহিমবাবু উঠে পড়ে বললেন, আমি এসেছি বাবার সঙ্গে আমাদের পুরনা ব্যবসা সংক্রান্ত কিছু জরুরি ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করতে। সেটা যদিন না সম্ভব হচ্ছে, তদ্দিন আমাকেও থাকতে হবে।

ভদ্রলোক চলে যাবার পর শুতে শুতে প্রায় বারোটা হল।

পাশের ঘর থেকে লালমোহনবাবু গুডনাইট করতে এলেন, যেমন রোজই আসেন। ওঁর রুমমেট আজ সকালে চলে গেছেন, উনি এখন একা। বললেন, ভাল কথা, আপনি তো আজ কাঠমাণ্ডুতে ফোন করেছিলেন।

তা করেছিলাম।

কী ব্যাপার মশাই?

বীর হাসপাতালের ডাঃ ভার্গবকে জিজ্ঞেস করলাম, গত অক্টোবরে বিলাস মজুমদার নামে কোনও ব্যক্তি হেভি ইনজুরি নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল কি না।

কী বললেন?

বললেন, হ্যাঁ। শিনবোন, কলারবোন, পাঁজরার হাড়, থুতনি—সব বললেন।

আপনার বুঝি মজুমদারের কথা বিশ্বাস হয়নি?

সন্দেহ জিনিসটা গোয়েন্দাগিরির একটা অপরিহার্য অঙ্গ লালমোহনবাবু। কেন, আপনার গল্পের গোয়েন্দা প্রখর রুদ্র কি ওই বাতিক থেকে মুক্ত?

না না, তা তা নয়–মোটেই নয়. বিড়বিড় করতে করতে ভদ্রলোক ফিরে গেলেন ওঁর ঘরে।

বেশি রাত হলেই সমুদ্রের গর্জন শোনা যায় আমাদের ঘর থেকে। আমি জানি ফেলুদার মনের মধ্যেও ঢেউয়ের ওঠা-নামা চলেছে, যদিও বাইরে দেখছি। শান্ত গাম্ভীর্য। এটাও অবিশ্যি সমুদ্রেরই একটা রূপ। এই রূপটা নুলিয়ারা দেখতে পায় মাছের নীকো করে ব্রেকারস পেরিয়ে গেলে পর।

ওটা কী ফেলুদা?

বেডসাইড ল্যাম্পটা নেভাতে গিয়ে দেখি ফেলুদা পকেট থেকে একটা চ্যাপটা চৌকো। ব্রাউন রঙের জিনিস বার করে দেখছে।

ভাল করে দেখে বুঝলাম সেটা একটা মানিব্যাগ।

ব্যাগটার ভিতর থেকে কয়েকটা দশ টাকার নোট বার করে অন্যমনস্ক ভাবে দেখে সেগুলো আবার ভিতরে পুরে দিয়ে ফেলুদা বলল, এটা নিশীথবাবুর দেরাজে কিছু কাগজপত্তরের তলায় ছিল। আশ্চর্য! লোকটা বাক্স বিছানা নিয়েছে, অথচ পার্সটাই ভুলে গেছে।

১০. ফেলুদা যোগ ব্যায়াম করছে

চোখ খুলতেই যখন দেখলাম ফেলুদা যোগ ব্যায়াম করছে, তখন বুঝলাম সূর্য উঠতে এখনও অনেক দেরি। অথচ এটা জানি যে ও অনেক রাত পর্যন্ত ল্যাম্প জ্বলিয়ে কাজ করেছে।

একটা শব্দ শুনে বারান্দার দিকের জানালাটার দিকে চাইতে দেখি, লালমোহনবাবুও এরই মধ্যে উঠে পড়ে টুথব্রাশে ওঁর প্রিয় লাল সাদা ডোরাকাটা সিগন্যাল টুথপেস্ট লাগাচ্ছেন। বুঝলাম, আমাদের দুজনের মনের একই অবস্থা।

ফেলুদা ব্যায়াম শেষ করে বলল, চা খেয়েই বেরিয়ে পড়ব।

কোথাও যাবার আছে বুঝি?

মাথাটা পরিষ্কার করা দরকার। বিশালত্বের সামনে পড়লে সেটা সময় সময় হয়। ভোরের সমুদ্রের দিকে চাইলেই একটা টনিকের কাজ দেয়।

বেরোবার আগে শ্যামলাল বারিকের ঘরে গিয়ে ফেলুদা বলল, শুনুন, কয়েকটা ব্যাপার আছে। নেপালে একটা কল বুক করতে হবে, এই নিন নম্বর। আর মহাপাত্রের কাছ থেকে কোনও মেসেজ এলে রেখে দেবেন। আর, হ্যাঁ—এখানে খুব ভাল অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার কে আছে?

কটা চাই? আপনি কি ভাবছেন অজ পাড়াগাঁয়ে এসে পড়েছেন?

বুড়ো হাবড়া হলে চলবে না। ইয়াং চৌকস ডাক্তার চাই।

বেশ তো, ডাঃ সেনাপতি আছেন। গ্র্যান্ড রোডে উৎকল কেমিস্টে চেম্বার আছে। সকালে দশটার পর গেলেই দেখা পাবেন।

আমরা বেরিয়ে পড়লাম।

সমুদ্রের ধারে স্নানের লোক এখনও কেউ আসেনি, শুধু নুলিয়া ছাড়া আর কোনও মানুষ দেখা যাচ্ছে না। পুবের আকাশ ফিকে লাল, ছাই রঙের মেঘের টুকরোগুলোর নীচের দিকটা গোলাপি হয়ে আসছে। সমুদ্র কালচে নীল, শুধু তীরে এসে ভাঙা ঢেউয়ের মাথাগুলো সাদা।

প্রথমদিন এসে যে তিনটে নুলিয়া ছেলেকে তীরে বসে খেলতে দেখেছিলাম, কাঁকড়া সম্বন্ধে তাদের ভীষণ কৌতুহল। ওই কাঁকড়াই হল। লালমোহনবাবুর মতে পুরীর সমুদ্রতটের একমাত্র মইনাস পয়েন্ট।

কী নাম রে তোর?

তিনটে নুলিয়া ছেলের একটার মাথায় পাগড়ির মতো করে বাঁধা লাল কাপড়; সে ফেলুদার প্রশ্নে দাঁত বার করে হেসে বলল, রামাই, বাবু।

আমরা এগিয়ে চললাম। লালমোহনবাবুর কবিত্বভাব জেগে উঠেছে, বললেন, এই উন্মুক্ত উদার পরিবেশে রক্তপাত! ভাবা যায় না মশাই।

হুঁ—ব্লান্ট ইনসট্রুমেন্ট... অন্যমনস্কভাবে বলল ফেলুদা। আমি জানি অস্ত্র দিয়ে খুনটা সাধারণত তিন রকমের হয়। এক হল আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে—যেমন রিভলভার পিস্তল; দুই; শার্প ইনস্টুমেন্ট, যেমন ছারা-ছুরি-চাকু ইত্যাদি; তিন হল ব্লান্ট ইনস্টুমেন্ট বা ভোঁতা হাতিয়ার, যেমন ডাণ্ডা জাতীয় কিছু। বেশ বুঝতে পারলাম ফেলুদা কাল রাত্রে ওর মাথায় বাড়ি লাগার কথাটা ভাবছে। সত্যি, ভাবলে রক্ত জল হয়ে যায়। ভাগ্যে আঘাতটা মোক্ষম হয়নি।

ফুটপ্রিন্টস... ফেলুদা বলে উঠল।

একটু এগিয়ে গিয়েই দেখতে পেলাম টাটকা পায়ের ছাপ। জুতো, আর সেই সঙ্গে বাঁ হাতে ধরা লাঠি।

বিলাসবাবু খুব আলি রাইজার বলে মনে হচ্ছে, মন্তব্য করলেন লালমোহনবাবু।

বিলাসবাবু? বিলাসবাবু বলে মনে হচ্ছে কি? দেখুন তো ভাল করে—দূরে সামনের দিকে দেখিয়ে বলল ফেলুদা।

এত দূর থেকেও বুঝতে পারলাম, যিনি বালিতে দাগ ফেলতে ফেলতে এগিয়ে চলেছেন তিনি মোটেই বিলাসবাবু নন।

তই তো! বললেন লালমোহনবাবু, ইনি তো দেখছি আমাদের সেনসেশনাল সেন সাহেব।

ঠিক ধরেছেন। দুগার্গতি সেন।

কিন্তু তা হলে গেঁটে বাত?

সেইখানেই তো ভেলকি! লক্ষ্মণ ভট্টাচার্যের ওষুধের গুণ বোধহয়?

মনে ধাঁধাটে ভাব নিয়ে আবার হাঁটা শুরু করলাম। রহস্যের পর রহস্য যেন ঢেউয়ের পর ঢেউ।

বাঁয়ে রেলওয়ে হোটেল দেখা যাচ্ছে। ডাইনে গোটা পাঁচেক নুলিয়া আর সুইমিং ট্রাঙ্কস পরা তিনজন সাহেব। তার মধ্যে একজন ফেলুদার দিকে হাত তুললেন।

গুড মর্নিং!

আন্দাজে বুঝলাম ইনিই কালকের সেই পুলিশকে ফোন করা আমেরিকান।

আমরা এগিয়ে গেলাম। ওই যে হিঙ্গোরানি আসছেন, কাঁধে তোয়ালে। ভারী অপ্রসন্ন মনে হচ্ছে ভদ্রলোককে। আমাদের দিকে দেখলেনই না।

আমার মন কেন জানি বলছে ফেলুদা সাগরিকায় যাচ্ছে, কারণ ও সমুদ্রের ধারের বালি ছেড়ে বাঁয়ে চড়াইয়ে উঠতে শুরু করেছে। সূর্যের আধখানা কিন্তু এর মধ্যেই উঠে বসে আছে। ফেলুদার মাথা বিশালত্বের সামনে পড়ে পরিষ্কার হয়েছে কি?

প্রাতঃপ্রণাম।

গণৎকার মশাই এগিয়ে এসেছেন বালির উপর দিয়ে, লুঙ্গিটা খাটা করে পরা, কাঁধে তোয়ালে, হাতে নিমের দাঁতন।

কাল কোথায় ছিলেন? ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

কখন?

সন্ধেবেলা; আপনার খোঁজ করেছিলাম।

ওহো। কাল গোসলাম কের্তন শুনতে। মঙ্গলাঘাট রোডে একটা কের্তনের দল আছে; মাঝে-মধ্যে যাই।

কখন গিয়েছিলেন?

আমার তো ছটার আগে ছুটি নেই। তারপরেই গোসলাম।

আপনি তো ও বাড়ির বাসিন্দা, তাই ভাবছিলাম চুরির ব্যাপারে যদি কোনও আলোকপাত করতে পারেন। আপনার ঘর থেকে পশ্চিমের গলিটা তো দেখা যায়।

তা তো যায়ই, তবে পশ্চিমের গলিতে যা দেখেছি তাতে খুব অবাক হইনি, বললেন লক্ষ্মণ ভট্টাচার্য। নিশীথবাবুকে দেখলাম তল্পিতল্পা নিয়ে বেরুতে। তা উনি যে কলকাতায় যাবেন সেটা তো ক'দিন থেকেই ঠিক ছিল।

তাই বুঝি?

ওঁর মা-র যে এখন–তখন অবস্থা। টেলিগ্রাম এসেছিল। ক’দিন আগে।

বটে? আপনি দেখেছিলেন সে টেলিগ্রাম?

শুধু আমি কেন? সেন মশাইও দেখেছিলেন।

ফেলুদা অবাক।

আশ্চর্য! সেন মশাই তো সে কথা বললেন না।

সে আর কী বলব বলুন! উনি মানুষটা কী রকম সেটা তো আপনারাও দেখলেন। দুভোগ আছে আর কী। কপালের লিখন খণ্ডায় কার সাধ্যি বলুন!

আপনি মিঃ সেনেরও ভাগ্য গণনা করেছেন নাকি? ভারী ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন। লালমোহনবাবু।

এ তল্লাটে কার করিনি? কিন্তু করলে কী হবে? সবাইকে তো আর সব কথা বলা যায় না। অবিশ্যি ব্যারাম-ট্যারামের লক্ষণ দেখলে বলি; তাই বলে, আপনি খুন করবেন, আপনার। জেল হবে, ফাঁসি হবে, অপঘাতে মৃত্যু আছে আপনার–এসব কি বলা যায়? তা হলে আর কেউ আসবে না মশাই। আসলে লোকে ভালটাই শুনতে চায়। তাই অনেক হিসেব করে ঢেকে ঢুকে বলতে হয়।

লক্ষ্মণ ভট্টাচার্য বিদায় জানিয়ে সমুদ্রের দিকে চলে গেলেন। আমরা এগিয়ে চললাম সাগরিকার দিকে। সকালের রোদ পড়ে বাড়িটাকে সত্যিই সুন্দর দেখাচ্ছে।

হত্যাপুরী, বললেন লালমোহনবাবু।

সে কী মশাই প্রতিবাদের সুরে বলল ফেলুদা, হত্যা কোথায় হল যে হত্যাপুরী বলছেন? বরং চুরিপুরী বলতে পারেন।

নট সাগরিকা বললেন লালমোহনবাবু। –আমি এ দিকের বাড়িটার কথা বলছি।

সাগরিক থেকে আন্দাজ ত্রিশ গজ। এই দিকে বালিতে বসে যাওয়া এই বাড়িটার কথা আগেই বলেছি। লালমোহনবাবু খুব ভুল বলেননি। এমনিতেই পোড়া নোনাধরা বাড়ি দেখলে কেমন গা ছমছম করে, এটার আবার তলার দিকের হাত-পাঁচেক বালিতে বসে যাওয়াতে, আর কাছাকাছি অন্য কোনও বাড়ি না থাকতে সত্যিই বেশ ভূতুড়ে মনে হচ্ছিল। দিনের বেলাতেই এই রাত্রে না জানি কী রকম হবে।

অন্যান্য দিন বাড়িটাকে পাশ কাটিয়ে যাই, আজ একটু কাছ থেকে দেখার লোভ সামলাতে পারল না বোধহয় ফেলুদা। ফটকের থামগুলো এখনও রয়েছে, তার একটার গায়ে কালসিটে মেরে যাওয়া শ্বেতপাথরের ফলকে লেখা ভুজঙ্গ নিবাস। বালি আর এক হাত উঠলেই ফলকটা ঢাকা পড়ে যাবে। ফটিক পেরিয়ে বোধহয় এককালে একটা ছোট্ট বাগান ছিল, তারপরেই সিঁড়ি উঠে গিয়ে বারান্দা। সিঁড়ির শুধু ওপরের দুটো ধাপ বেরিয়ে আছে, বাকিগুলো বালির নীচে। বারান্দার রেলিং ক্ষয়ে গেছে, ছাত যে কেন ধসে পড়েনি জানি না। বারান্দার পরে যে ঘর, সেটা নিশ্চয়ই বৈঠকখানা ছিল।

একেবারে পরিত্যক্ত বলে তো মনে হচ্ছে না, ফেলুদা মন্তব্য করল। করার কারণটা স্পষ্ট। লোকের যাতায়াত আছে, সেটা বারান্দার বালির উপর পায়ের ছাপ থেকে বোঝা যায়।

আর দেশলাইয়ের কাঠি, ফেলুদা।

একটা নয়, তিন-চারটে। সিঁড়ি উঠেই বারান্দার বা দিকের থামটার পাশে।

সমুদ্রের হাওয়ায় সিগারেট ধরাতে গেলে কাঠি খরচা একটু বেশি হবেই।

আমরা ফটকের মধ্যে ঢুকলাম। সাংঘাতিক কৌতুহল হচ্ছে বাড়িটার ভিতরে ঢোকার। দরজা নিশ্চয়ই খোলা যায়, কারণ দমকা বাতাসে সেটা খটখট করে নড়ছে; একেবারে যে খুলছে না, সেটা ঘরের মেঝেতে জমে থাকা বালিতে বাধা পাওয়ার জন্য।

পায়ের ছাপগুলো ফেলুদা খুব মন দিয়ে দেখল। প্রায় দেখা যায় না বললেই চলে, কারণ ক্রমাগতই হাওয়ার সঙ্গে বালি এসে তার উপর জমা হচ্ছে।

কিন্তু জুতোর ছাপ তাতে সন্দেহ নেই।

এ ছাড়াও আর একটা জিনিস আছে সেটা পা দিয়ে খানিকটা বালি সরাতেই বেরিয়ে পড়ল।

আমার মনে হল পানের পিক, যদিও লালমোহনবাবুর মতে নিঃসন্দেহে ব্লাড।

লালমোহনবাবু একবার মৃদুস্বরে ব্রেকফাস্ট কথাটা বলতে বুঝলাম ওঁর আর এগোতে সাহস হচ্ছে না। আমারও বুক টিপটপ করছে, কিন্তু ফেলুদা নির্বিকার।

তা হলে হত্যাপুরীতে একবার প্রবেশ করতে হয়।

এটা জানাই ছিল। এতদূর এসে পায়ের ছাপটাপ দেখে ফেলুদা চট করে পিছিয়ে যাবে না।

ক্যাঁ–চ শব্দে দরজার দুটো পাল্লাই খুলে গেল ফেলুদার দু হাতের চাপে।

বাদুড়ে গন্ধ। বাইরে থেকে ভিতরের কিছুই দেখা যায় না, কারণ ভিতরে জানালা থেকে থাকলেও তা নিশ্চয়ই বন্ধ। আর দরজা দিয়ে যে আলো ঢুকবে তার পথ আপাতত আমরাই বন্ধ করে রেখেছি।

ফেলুদা চৌকাঠ পেরোল। আমি জানি ঘুটঘুটে রাত্তির হলেও ও দ্বিধা করত না, তফাত হত এই যে ওর সঙ্গে তখন হয়তো ওর কোল্ট রিভলভারটা থাকত।

আসুন ভিতরে।

আমি ঢুকে গেছি, কিন্তু লালমোহনবাবু এখনও চৌকাঠের বাইরে। –অল ক্লিয়ার কি? অস্বাভাবিক রকম চড়া গলায় জিজ্ঞেস করলেন ভদ্রলোক।

ক্লিয়ার তো বটেই। আরও ক্লিয়ার হবে ক্রমে ক্রমে। এসে দেখুন না। কী আছে। ঘরের মধ্যে।

আমি অবিশ্যি এর মধ্যেই দেখে নিয়েছি।

প্রথমেই চোখে পড়েছে একটা টিনের ট্রাঙ্ক আর শতরঞ্চিতে মোড়া একটা বেডিং। ঘরের এক পাশে দেয়ালের সামনে যেমন-তেমন করে ফেলে রাখা হয়েছে সে দুটো।

পুলিশের পণ্ডশ্রম, বলল ফেলুদা,নিশীথবাবু যাননি।

তবে কোথায় গেলেন ভদ্রলোক? লালমোহনবাবু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন। ফেলুদা কথাটা গ্রাহ্য করল না।

হুঁ-ভেরি ইন্টারেস্টিং।

ঘরের এক কোণে স্তুপ করে রাখা রয়েছে সরু আর লম্বা-করে কাটা কাঠ, আর পাশেই ফিতোয় মোড়া দিস্তা দিস্তা ফিকে হলদে রঙের সস্তা কাগজ।

বলুন তো এ থেকে কী বোঝা যায়, ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

ও তো পুঁথির কাঠ বলে মনে হচ্ছে। আর ওই, ইয়ে–

লালমোহনবাবু এত সময় নিচ্ছেন কেন জানি না। আমি বললাম, মনে হচ্ছে নিশীথবাবু একেবারে ব্যবসা খুলে বসেছিলেন–ডামি পুঁথি তৈরি করার। সাইজমাফিক কাগজ কেটে দুদিকে কাঠ চাপা দিয়ে শালুতে মুড়ে দিলে বাইরে থেকে ঠিক পুঁথি।

এগজ্যাক্টলি, বলল ফেলুদা—আমার বিশ্বাস, সেন মশাইয়ের সব পুঁথিগুলো বার করে খুললে দেখা যাবে তার অনেকগুলোই কেবল সাদা কাগজ। আসলগুলো পাচার হয়ে গেছে। হিঙ্গোরানি সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে।

ও হা হা!—লালমোহনবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন—সাপ, সাপ। সেদিন একটা কাগজের ফালি দেখেছিলাম সাগরিকার গলিতে—সে তা হলে এই কাগজ।

নিঃসন্দেহে, বলল ফেলুদা।

এর পরে যে ঘটনাটা ঘটল সেটা লিখতে আমার হাত না কাঁপলেও, বুক কাঁপছে।

বৈঠকখানায় ঢুকেই ডাইনে-বাঁয়ে মুখোমুখি দুটো দরজা রয়েছে পাশের দুটো ঘরে যাবার জন্য। লালমোহনবাবু ডান দিকের দরজাটার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমরা সামনের দরজা খুলে ঢোকাতে সেটা দিয়ে শোঁ শোঁ শব্দে সমুদ্রের বাতাস ঢুকিছিল। একটা দমকা হাওয়ার ফলে হঠাৎ ডাইনের দরজাটা প্রচণ্ড শব্দে খুলে গেল, লালমোহনবাবু চমকে উঠে খোলা দরজাটার দিকে চাইলেন, আর চাইতেই তাঁর চোখ কপালে উঠে গেল। ভদ্রলোক পড়েই যেতেন যদি না ফেলুদা এক লাফে গিয়ে ওঁকে জাপটে ধরে ফেলত।

এগিয়ে গিয়ে দেখি একটা লোক চোখ উলটে মরে পড়ে আছে পাশের ঘরের মেঝেতে।

তার মাথা থেকে বেরোনো রক্ত চাপ বেঁধে আছে মেঝের উপর।

লোকটাকে চিনতে কোনওই অসুবিধা হল না।

ইনি দুগার্গতি সেনের সেক্রেটারি নিশীথ বাস।

১১. ফেলুদার আর ব্রেকফাস্ট খাওয়া হল না

ফেলুদার আর ব্রেকফাস্ট খাওয়া হল না।

রেলওয়ে হোটেল থেকে টেলিফোনে পুলিশ খবর দিয়ে আমরা আমাদের হোটেলে চলে এলাম। ফেলুদা বলল যে ওর দু-একটা কাজ আছে, বিশেষ করে নুলিয়া বস্তিতে একবার যাওয়া দরকার, কাজেই ও একটু পরে ফিরবে। লাশ ছোঁয়াছুয়ি না করেই ও বলল যে, বাঝাই যাচ্ছে লোকটাকে মারা হয়েছে একটা ব্লান্ট ইনস্টুমেন্ট দিয়ে—যদিও সে ধরনের কোনও হাতিয়ার কাছাকাছির মধ্যে পেলাম না।

লালমোহনবাবু না জেনে মোক্ষম নাম দিয়েছিলেন বাড়িটার এটা স্বীকার করতেই হবে, যদিও পরে বলেছিলেন যে পুরী কথাটা বাড়ি অর্থে ব্যবহার করেননি। উনি মিন করেছিলেন পুরী শহর।তিন দিনের মধ্যে দু-দুটো খুন, হত্যাপুরী ছাড়া আর কী?

একটা সুখবর দিয়ে রাখি। দুর্গাগতিবাবুর সঙ্গে তাঁর ছেলের মিটমাট হয়ে গেছে। অন্তত দেখে তাই মনে হল। আমরা যখন ভুজঙ্গ নিবাস থেকে বেরোচ্ছি, তখন সাগরিকার দিকে চোখ পড়তে দেখি ছাতে দুজন লোক। বাপ আর ছেলে। শুধু তাই নয়, ছেলে আমাদের দিকে হাত নাড়লেন, কাজেই বুঝলাম খোশ মেজাজে আছেন। এটাও আমার কাছে কম রহস্য নয়।

ফেলুদা যখন ঘরে এসে ঢুকাল তখন পৌনে এগারোটা। আমার মনে পড়ে গেল নেপালে টেলিফোনের কথাটা। বললাম, কলটা পেয়েছিলে?

এই তো কথা বলে আসছি।

কলটা কি কাঠমাণ্ডুতে করেছিলে?

উঁহু, পাটন। কাঠমাণ্ডুর কাছেই বাঘমতী নদী পেরিয়ে একটা পুরনো শহর।

লালমোহনবাবু বললেন, যাই বলুন, লাশের কাছে ভূত কিছুই না। এখনও ভাবলে শিভারিং হচ্ছে।

সব শিভারিং খরচা করে ফেলবেন না, রাত্তিরের জন্য কিছু হাতে রাখবেন।

রাত্তিরে?

আমরা দুজনেই ফেলুদার দিকে চাইলাম। ও একটা ওমলেটের আধখানা মুখে পুরে দিয়ে বলল, এক পায়ে না হলেও, খাড়া থাকতে হবে আজ রাত্তিরে।

কোথায়? লালমোহনবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

দেখতেই পাবেন।

কারণটা কী?

জানতেই পাবেন।

লালমোহনবাবু চুপসে গেলেন। অবিশ্যি এটা ওঁর কাছে নতুন কিছু না।

সেনাপতি দিব্যি স্মার্ট ডাক্তার, বলল ফেলুদা।

তুমি এর মধ্যে ডিসপেনসারি ঘুরে এলে?

ভদ্রলোক দুর্গ সেনের ট্রিটমেন্ট করেছেন সেটা জানলাম। এপ্রিলে আমেরিকা ঘুরে এসেছেন। ওষুধটা ওঁরই আনা।

ডায়াপিড?—নামটা মনে ছিল তাই জিজ্ঞেস করলাম।

তোর প্রশ্ন শুনে বুঝতে পারছি ওষুধটা তোর কোনও কাজে লাগবে না।

থানা থেকে ফোন এল পীনে বারোটায়। ডাক্তারের রিপোর্ট বলছে, নিশীথবাবু খুন হয়েছেন গতকাল সন্ধ্যা ছটা থেকে রাত আটটার মধ্যে, আর তাঁকে মারা হয়েছে কোনও ব্লান্ট ইনফ্লুমেন্ট দিয়ে। হাতিয়ার খুঁজে পাওয়া যায়নি। ভুজঙ্গ নিবাসের বাইরে গেটের ধারেই মনে হয় খুনটা হয়েছে, তারপর মৃতদেহ টেনে নিয়ে ওই ঘরে ফেলে দেওয়া হয়, কারণ বারান্দার বালির নীচে রক্তের দাগ পাওয়া গেছে।

আমি একটা জিনিস আন্দাজ করছি, যদিও ফেলুদাকে এ বিষয়ে কিছু বলিনি এখনও। যে লোক নিশীথবাবুকে খুন করেছিল, সে লোকই ফেলুদার মাথায় বাড়ি মেরেছে, আর একই অস্ত্র দিয়ে। তাই ফেলুদার মাথায় রক্ত লেগে ছিল।

সাড়ে বারোটা নাগাত ভাবছি লাঞ্চটা সেরে নেওয়া যায় কি না, কারণ লালমোহনবাবু কিছুক্ষণ থেকেই বলছেন রান্নাঘর থেকে টেরিফিক পেঁয়াজ-রসুনের গন্ধ পাচ্ছেন, এমন সময় বিলাস মজুমদার এসে হাজির।

কী মশাই, যাবেন নাকি? ঘরে ঢুকেই ভদ্রলোকের প্রশ্ন।

কোথায়?—ফেলুদা বিছানায় কাত হয়ে শুয়ে কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে ওর খাতায় কী যেন লিখছিল।

টুরিস্ট ডিপার্টমেন্টের এয়ার-কন্ডিশন্ড লিমুজিন। ছ জনের জায়গা, মাত্র দুজন যাচ্ছি। আমি, আর একটি অ্যামেরিকান-নাম স্টেডম্যান। ভাবতে পারেন—এও ওয়াইল্ড লাইফ! কেওনঝরগড় যাচ্ছে। খুব মিশুকে। ভাল লাগত। আপনার।

কখন বেরোচ্ছেন?

লাঞ্চ খেয়েই।

না, থ্যাঙ্ক ইউ, বলল ফেলুদা, আমার একটু কাজ আছে। বরং আপনি যদি থেকে যেতেন তো পুরীর ওয়াইল্ড লাইফের কিছুটা নমুনা দেখে যেতে পারতেন।

নো, থ্যাঙ্ক ইউ, হেসে বললেন বিলাস মজুমদার।

ভদ্রলোক ঘর থেকে বেরোনোর মিনিট খানেকের মধ্যেই একটা ভারী অ্যামেরিকান গাড়ির শব্দ পেলাম। বুঝলাম গাড়িটা মুখ ঘুরিয়ে উত্তর দিকে চলে গেল।

***

শেষ কবে যে চাপা উত্তেজনার মধ্যে এতটা সময় কাটাতে হয়েছে তা ভেবে মনে করতে পারলাম না।

রাত্তিরের খাওয়া সারার প্রায় ঘণ্টা খানেক পর দশটা নাগাত ফেলুদা বলল যে যাবার সময় হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এটাও বলে দিল যে যদিও ওর মন বলছে যে একটা কিছু ঘটতে পারে, পণ্ডশ্রম যে হবে না। এমন কোনও গ্যারান্টি নেই। –ফিটফটী স্মর্ট হয়ে নে। ওসব কুতর্গ পায়জামা চলবে না। সাদা জামা চলবে না। অন্ধকারে গা-ঢাকা দেবার জন্য কী পরতে হয় সেটা আশা করি আর বলে দিতে হবে না।

না। তার দরকার নেই। পার্ক স্ট্রিটের গোরস্থানেও আমাদের ঠিক এই কাজই করতে হয়েছিল।

হোটেল থেকে বেরিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে দেখলাম তারা দেখা যাচ্ছে না। লালমোহনবাবু এমনিতেই ঘন ঘন আকাশের দিকে দেখেন, তবে সেটা তারা দেখার জন্য নয়, স্কাইল্যাবের চিহ্ন দেখার জন্য। আজ সমুদ্রের দিক থেকে প্রচণ্ড হাওয়া বইছে দেখে বললেন, হাওয়া উলটামুখো হলে টুকরোগুলো তাও সমুদ্রে পড়ার চান্স ছিল। এখন কিসু বলা যায় না।

ভুজঙ্গ নিবাসের চারিদিকে যদিও বালি, বিচটা কিন্তু বাড়ি থেকে প্রায় পঞ্চাশ-ষাট গজ পুবে। যেখানে বিচা শুরু হয়েছে সেখানে রেলওয়ে হোটেল থেকে যারা স্নান করতে আসে তাদের জন্য বাঁশের খুঁটির ওপর হাগলা দেওয়া কয়েকটি ছাউনি রয়েছে। তারই একটার পাশে এসে ফেলুদা থামল।

পশ্চিম দিকের আকাশটা শহরের আলোর জন্য খানিকটা ফিকে, আমাদের পিছনে সমুদ্রের দিকে গাঢ় অন্ধকার। সামনের দিকে লোক হেঁটে গেলে তাকে ছায়ামূর্তির মতো দেখা যাবে, কিন্তু চেনা যাবে না। সে লোক কিন্তু আমাদের দেখতেই পাবে না।

মনে মনে বললাম, মোক্ষম জায়গা বেছেছে ফেলুদা, যদিও কেন বেছেছে জানি না, জিজ্ঞেস করলেও কোনও উত্তর পাব না। ওর এই অভ্যোসটার জন্য লালমোহনবাবু একবার বলেছিলেন, আপনি মশাই সাসপেন্স ফিলিম তৈরি করুন। লোকে দেখে দিম ফেলতে পারবে না। কোথায় লাগে হচকিক্।

সাগরিকার তিনতলায় দুর্গাগতিবাবুর ঘরে এখনও আলো জ্বলছে; দোতলার আলো এইমাত্র নিভল। পাঁচিলের উপর দিয়ে লক্ষ্মণ ভট্টাচার্যের একতলার ঘরের জানালার একটি ফালি দেখা যাচ্ছে; বুঝতে পারছি সে ঘরে এখনও আলো জ্বলছে।

আমরা তিনজনেই ছাউনির তলায় বালির উপর বসেছি। কথা বলার কোনও প্রশ্নই ওঠে। না, আর বলতে হলেও গলা-না তুললে হাওয়ায় আর সমুদ্রের গর্জনে কথা হারিয়ে যাবে। চোখ খানিকটা সয়ে এসেছে। অন্ধকারে; ডাইনে চাইলে বেশ বুঝতে পারছি জটায়ুর কানের পাশের চুলগুলো বাতাসে মোরগের ঝুঁটির মতো খাড়া হয়ে উঠেছে। বাঁয়ে ফেলুদা; ও এইমাত্র বাঁ কবজিটা চোখের কাছে এনে ওর রেডিয়াম-ডায়াল ঘড়িটাতে সময় দেখল। তারপর বুঝলাম ঝোলাতে হাত ঢুকিয়ে একটা জিনিস বার করে ওর চোখের সামনে ধরল।

ওর জাপানি বাইনোকুলার।

ফেলুদা কী দেখছে জানি।

দুর্গতি সেনকে দেখা যাচ্ছে ওঁর শোবার ঘরের জানালায়, কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে দু পা বাঁয়ে সরে ডান হাত বাড়িয়ে কী জানি একটা তুললেন।

গেলাস।

কী খেলেন ভদ্রলোক গেলাস থেকে?

একতলার ঘরে বাতি এইমাত্র নিভে গেছে, এবার তিনতলার বাতি নিস্তল, আর নিভতেই আমাদের আশেপাশের অন্ধকার যেন হঠাৎ আরও গাঢ় হয়ে গেল।

কিন্তু এখনও আমাদের মধ্যে কেউ নড়াচড়া করলে বেশ বুঝতে পারছি।

যেমন লালমোহনবাবু তাঁর পকেট থেকে টর্চটা বার করলেন।

কিন্তু কেন? কী মতলব ভদ্রলোকের?

আমি বুকে পড়ে ওঁর কানের সঙ্গে মুখ লাগিয়ে বললাম, জ্বালাবেন না, খবরদার ভদ্রলোক উত্তরে আমার কানে মুখ এনে বললেন, ব্লান্ট ইনস্ট্রুমেন্ট, হাতে থাক।

উনি মুখ সরিয়ে নেওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটা জিনিস দেখে আমার হৃৎপিণ্ডটা এক লাফে গলার কাছে চলে এল।

ইনে হাত দশেক দূরে আরেকটা হাগলার ছাউনি।

তার পাশে একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে।

কখন এসেছে জানি না।

লালমোহনবাবুও দেখেছেন, কারণ ওঁর কাঁপা হাত থেকে টর্চটা ঝুপ শব্দ করে বালির উপর পড়ে গেল।

আর ফেলুদা?

ও দেখেনি।

ওর দৃষ্টি সোজা সাগরিকার দিকে।

আমিও জোর করে চোখ সেই দিকেই ঘোরালাম।

আর তাই বোধহয় ফেলুদার সঙ্গে সঙ্গেই লোকটাকে দেখতে পেলাম।

সাগরিকার দিক থেকে লোকটা আসছে আমাদের দিকে।

না, এই দিকে না। ভুজঙ্গ নিবাসের দিকে।

লোকটাকে চেনার কোনও উপায় নেই।

এগিয়ে এল। ওই তা ভুজঙ্গ নিবাসের গেটের থাম।

গেটের কাছাকাছি পৌঁছে লোকটা হাঁটার গতি কমাল, তারপর হাটা থামল।

এবারে আরেকটা লোক। এতক্ষণ দেখিনি। বোধহয় বাড়িটার আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল।

দ্বিতীয় লোকটা প্রথম লোকটার দিকে এগিয়ে গেল।

গেটের সামনে এখন দুজন লোক।

এবার দুজনে ভাগ হল। যে সাগরিকার দিক থেকে এসেছিল সে আবার ফিরে–

সর্বনাশ! লালমোহনবাবুর অসাবধান আঙুলের চাপে ওঁর পাগলা টর্চ জ্বলে উঠেছে!

ফেলুদা এক থাপ্পড়ে টর্চটা বালিতে ফেলে দিল, আর সেই মুহূর্তে লালমোহনবাবুর চার ইঞ্চি ডাইনের বাঁশের খুঁটিটাতে কান-ফটানো শব্দের সঙ্গে একটা গুলি এসে লাগল।

তুই ওটাকে ধর।

ফেলুদা হাউইয়ের মতো লাফিয়ে উঠে ছুটে গেছে দ্বিতীয় লোকটাকে লক্ষ্য করে।

আশ্চর্য এই যে ওই একটা কথাতেই দেখলাম যে বিপদের তোয়াক্কা না করে আমিও নিঃশব্দে তীরবেগে ছুটতে শুরু করেছি। বালির উপর দিয়ে প্রথম লোকটাকে লক্ষ্য করে।

ফেলুদার আর আমার পথ ভাগ হয়ে গেল।

রাগবি খেলায় যেমন ফ্লাইং ট্যাকল করে একজন খেলোয়াড় আরেকজনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে জাপটে ধরে, আমিও ঠিক সেই ভাবে অব্যর্থ লক্ষ্যে লোকটার পা দুটোকে জাপটে ধরলাম।

লোকটা হুমড়ি খেয়ে পড়ল বালির ওপর। আমি লোকটার পিঠে, আমার দৃষ্টি ঘুরে গেছে ফেলুদার দিকে।

একটা হাড়ে-হাড়ে সংঘর্ষের শব্দের সঙ্গে ফিকে আকাশের সামনে দেখলাম একটা ছায়ামূর্তি আরেকটা ছায়ামূর্তিকে ঘুঁসি মেরে ধরাশায়ী করল।

ইতিমধ্যে লালমোহনবাবু এসে পড়েছেন, এবং এসেই মহা বিক্রমে আমার হাতে বন্দি লোকটার মাথা লক্ষ্য করে তাঁর হাতের ব্লান্ট ইনস্ট্রুমেন্টটা নিক্ষেপ করেছেন। একটা ভোঁতা শব্দে বোঝা গেল হাতিয়ার লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে এখন বালিতে লুটাপুটি খাচ্ছে।

ওকে নিয়ে আয় এদিকে।

আমরা দুজনে লোকটার দুই পা ধরে বালির উপর দিয়ে হেঁচড়ে টেনে নিয়ে গেলাম যেখানে রয়েছে ওরা দুজন। ফেলুদা দাঁড়ানো, অন্য লোকটি চিত, ফেলুদার একটা পা তার পেটের উপর, আর অন্যটা ডান হাতের তেলোর উপর-যে হাত থেকে রিভলভারটা আলগা হয়ে পড়ে আছে বালিতে।

আপনার থুতনিতে ক্ষতচিহ্ন ছিল না, কিন্তু আজ থেকে থাকবে।

আমার ওয়াইল্ড লাইফ কথাটা মনে পড়ল। অদ্ভুত হিংস্র চেহারা নিয়ে টর্চের তীব্র আলোতে কপাল কুঁচকে ফেলুদার দিকে চেয়ে আছেন বিলাস মজুমদার, তাঁর বাঁ হাতে আঁকড়ানো রয়েছে লাল শালু দিয়ে মোড়া একটা পুঁথি।

ফেলুদা ঝুকে পড়ে এক ঝটিকায় পুঁথিটা ছিনিয়ে নিয়ে নিজের ঝোলার মধ্যে রেখে দিল।

তারপর ওর টর্চ ঘুরে গেল আমাদের বন্দির দিকে।

আপনার থার্ড আই কী বলছে লক্ষ্মণবাবু? শেষটায় এই ছিল আপনার কপালে?

অন্ধকার থেকে আরও লোক বেরিয়ে এসেছে।

আসুন মিঃ মহাপাত্র, ফেলুদা হাঁক দিল। –এঁদের দুজনকে তুলে দিচ্ছি। আপনাদের হাতে, তবে কাজ ফুরোয়নি। আমরা হত্যাপুরীর বৈঠকখানায় একটু বসব। এরা দুজনও থাকবেন।

চারজন কনস্টেবল এগিয়ে এসে বিলাসবাবু আর লক্ষ্মণবাবুকে তুলে নিল।

মহিমবাবু আছেন তো! ফেলুদা পিছনের অন্ধকারের দিকে ফিরে প্রশ্ন করল।

আছি বইকী।

অন্ধকার থেকে সেই রহস্যজনক চতুর্থ ব্যক্তি বেরিয়ে এলেন। –বাবাও এসে পড়লেন বলে। ওই যে টর্চের আলো।

কোনও চিন্তা নেই, বললেন, মিঃ মহাপাত্র, মোড়া এনে রাখা হয়েছে। ঘরে–সবাই বসতে পারবেন।

লালমোহনবাবুর বাইরেই তো বেশ- কথাটা কারুর কানে গেল কি না জানি না, কারণ সবাই রওনা দিয়েছে ভুজঙ্গ নিবাসের দিকে।

১২. অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা

আসুন, মিঃ সেন, আপনার জন্যই ওয়েট করছি।

ফেলুদা এগিয়ে গেছে। দরজার দিকে।

মহিমবাবু তাঁর বাবাকে নিয়ে ঢুকলেন। তিনটে লণ্ঠন জ্বলছে ঘরের ভিতর। পুলিশের লোক ঝাড়পোঁছ করে ঘরের চেহারা ফিরিয়ে দিয়েছে।

দুর্গাগতিবাবু আর মহিমবাবু দুটো পাশাপাশি মোড়ায় বসলেন।

এই নিন আপনার কল্পসূত্র।

ফেলুদা সদ্য-পাওয়া পুঁথিটা দুর্গাগতিবাবুর হাতে দিলেন। ভদ্রলোক একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে তক্ষুনি আবার গভীর হয়ে গিয়ে উৎকণ্ঠার সুরে বললেন, আর অন্যটা?

সেটার কথায় আসছি, বলল ফেলুদা। –আপনি একটু ধৈর্য ধরুন। আপনি আজ আবার ঘুমের ওষুধ খাননি তো?

পাগল! ঘুমের ওষুধই তো আমার সর্বনাশ করল। কাল কী মিশিয়ে দিয়েছিল জলের সঙ্গে কে জানে?

দুর্গাগতিবাবু গভীর বিরক্তির ভাব করে পুলিশের হাতে বন্দি লক্ষ্মণ ভট্টাচার্যের দিকে চাইলেন।

ফেলুদা বলল, এত ভাল একজন অ্যালোপ্যাথ থাকতে আপনি এই হাতুড়ে হামবাগটিকে প্রশ্রয় দিচ্ছিলেন কেন বলুন তো?

কী করব বলুন! লোক যাচাই করার ক্ষমতা কি আর ছিল? সবাই এত সুখ্যাত করলে, যেচে এল আমার কাছে, বললে নিজের গরজে আমাকে সারিয়ে দেবে। আরও বললে, ওর সন্ধানে ভাল পুঁথি আছে–জ্যোতিষশাস্ত্রের পুঁথি...

ওই তো মুশকিল। পুঁথির কথা বললেই আপনার মন গলে যায়। যাই হোক ডায়াপিডে কাজ দিয়েছে তা? লুপ্ত স্মৃতি ফিরিয়ে আনার পক্ষে ওটাই তো সবচেয়ে নতুন আর সবচেয়ে ভাল ওষুধ বলে।

আশ্চর্য ওষুধ, বললেন মিঃ সেন, মুহূর্তে মুহূর্তে যেন স্মৃতির এক-একটা দরজা খুলে যাচ্ছে। সেনাপতি নিজে এসে ওষুধটা দিল বলেই তো হল। সেই যে আমার ডাক্তার সে কথাও তো ভুলে গিয়েছিলাম!

তা হলে বলুন তো, এই ভদ্রলোককে চেনেন কি না।

ফেলুদা তার টর্চ ফেলল বিলাস মজুমদারের মুখে। দুর্গাগতিবাবু তাঁর দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন, কালকেই চিনেছিলাম। গলার স্বর আর চাহনি থেকে। কেন যে তবু খটকা লাগছিল জানি না।

এর নামটা মনে পড়ছে?

পরিষ্কার–যদি না উনি নাম ভাঁড়িয়ে থাকেন।

সরকার কি? ফেলুদা প্রশ্ন করল।

সরকার, সায় দিয়ে বললেন দুর্গাগতিবাবু। পুরো নামটা কোনওদিন জানিনি।

লায়ার! চোখমুখ লাল করে চিৎকার করে উঠলেন অভিযুক্ত ভদ্রলোক। পাসপোর্ট দেখতে চান আমার?

না, চাই না-বরফের মতো ঠাণ্ডা গলায় বলল ফেলুদা। –আপনার মতো ধূর্ত লোকের পাসপোর্টের কী মূল্য? কী আছে পাসপোর্টে? বিলাস মজুমদার নাম আছে তো? আর চেহারার বিশেষত্বর মধ্যে কপালের আঁচিলের কথা বলেছে?–ডিসটিংগুইশিং মার্ক-মোল অন ফোরহেড- এই তো? তবে দেখুন-

কথাটা বলেই ফেলুদা ভদ্রলোকের দিকে হনহানিয়ে এগিয়ে গিয়ে পকেট থেকে এক ঝটিকায় একটা রুমাল বার করে সেটা দিয়ে একটা চাপড় মারুল ভদ্রলোকের কপালে, আর তার ফলে কৃত্রিম আচিল কপাল থেকে খুলে ছিটুকে গিয়ে পড়ল অন্ধকারে মেঝেতে।

আপনি বিলাস মজুমদার সম্বন্ধে অনেক খবর নিয়েছিলেন, ফেলুদা বলল দৃপ্তকণ্ঠে, স্নো লেপার্ডের ছবি তুলতে গিয়ে পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়া, কোন হাসপাতালে গিয়েছিল, কী কী হাড় ভেঙেছিল, গত মাস অবধি সে হাসপাতালে ছিল-এ সবই আপনি জানতেন। কিন্তু একটি সংবাদ আপনার কানে পৌঁছয়নি। খবরের কাগজে সেই সংবাদটাই আমি পড়েছিলাম, কিন্তু তেমন মন নিয়ে পড়িনি। খবরটা কালকে আমি পেয়েছি। কাঠমাণ্ডুর বীর হাসপাতালের ডাঃ ভার্গবের কাছ থেকে। সেটা হল এই–বিলাস মজুমদারের সবচেয়ে মারাত্মক ইনজুরি হয়েছিল ব্রেনে। তিন সপ্তাহ আগে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

লণ্ঠনের আলোতেও বুঝতে পারছি লোকটার মুখ কাগজের মতো সাদা হয়ে গেছে।

শুনুন মিঃ সরকার, ফেলুদা বলে চলল, আপনার পেশা পাসপোর্টে লেখা যায় না। আপনার পেশা স্মাগলিং। নিজে সব সময় চুরি না করলেও, চোরাই মাল পাচার করেন আপনি। ভাতগাঁওয়ের প্যালেস মিউজিয়াম থেকে চুরি করা পুঁথি আপনার হাতে আসে কাঠমাণ্ডুতে। তার পরের ঘটনা যে কী, সেটা শুনুন মিস্টার সেনের মুখে।

দুর্গতি সেনের চাহনিতে এমন কঠিন গাম্ভীর্যের ভাব এর আগে দেখিনি। ভদ্রলোক বললেন :

কাঠমাণ্ডুতে একই হোটেলে ছিলাম। এই ভদ্রলোক আর আমি। পাশাপাশি ঘর-এক'দিন ভুল করে আমার চাবি ওঁর ঘরে লাগিয়ে দেখি দরজা খুলে গেছে। ভেতরে উনি ছাড়া দুজন লোক, তাদের একজন বাক্স থেকে একটা লাল মোড়ক বার করে ওঁকে দিচ্ছে। দেখেই বুঝলাম পুঁথি। খটকা লাগল। মাপা চেয়ে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। সেই রাত্রে ঘুমের মধ্যে কী হল জানি না, জ্ঞান হল হাসপাতালে। মাথা ব্ল্যাঙ্ক। এই ঘটনার আগের সব স্মৃতি মন থেকে মুছে গেছে! হোটেলে খোঁজ করে আমার নাম-ঠিকানা পায়, এখানে খবর দেয়, নিশীথ গিয়ে আমাকে নিয়ে আসে। সাড়ে তিন মাস ছিলাম হাসপাতালে।

আপনার না-জানা অংশ আমি বলছি, বলল ফেলুদা, ভুল হলে মিঃ সরকার যেন শুধরে দেন। -আপনাকে সেই রাত্রে অজ্ঞান করে গাড়িতে নিয়ে তুলে শহরের বাইরে গিয়ে পাহাড়ের গা দিয়ে পাঁচশো ফুট নীচে ফেলে দেওয়া হয়। মিঃ সরকারের ধারণা ছিল আপনার মৃত্যু হয়েছে। ন মাস পরে হয়তো চোরাই মাল পাচার করতেই পুরীতে এসে ডি. জি. সেন নাম দেখে খটকা লাগে। আমার ধারণা আপনার বাড়ির একতলার বাসিন্দা গণৎকার লক্ষ্মণ ভট্টাচার্যের কাছ থেকে আপনার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে যাবতীয় ইনফরমেশন পান মিঃ সরকার। তাই নয় কি?

ঝিমিয়ে পড়া লক্ষ্মণ ভট্টাচার্য হঠাৎ যেন চাঙ্গা হয়ে উঠলেন—এ সব কী বলছেন। মশাই-উনি তো আপনাদের সঙ্গে প্রথম এলেন আমার বাড়িতে!

বটে?—ফেলুদা এগিয়ে গেছে লক্ষ্মণ ভট্টাচার্যের দিকে। তা হলে বলুন তো গণৎকার মশাই, পরিচয় হবার আগেই আপনি কেন ভদ্রলোককে তক্তপোশে বসতে বললেন আর আমাদের চেয়ার দেখিয়ে দিলেন? উনিই যে বিলাস মজুমদার, আমি নই, সেটা আপনি কী করে জানলেন?

এই এক প্রশ্নে লক্ষ্মণ ভট্টাচার্য আশ্চর্যভাবে কুঁকড়ে গেলেন।

ফেলুদা বলে চলল, আমার বিশ্বাস দুর্গাগতিবাবুর স্মৃতি লোপ পাবার কথাটা জেনে, এবং লক্ষণ ভট্টাচার্যের সাহচর্যের প্রতিশ্রুতি পেয়ে, সরকার মশাইয়ের মনে পুঁথি চুরির আইডিয়াটা আসে। ভাল খদ্দেরও রয়েছে একই হোটেলে–মিঃ হিঙ্গোরানি। কিন্তু এই ব্যাপারে তিনটে মুশকিল দেখা দেয়। প্রথমটা হল–একজন অবাঞ্ছিত লোক মিঃ সরকারকে ধাওয়া করে এখানে এসে হাজির হয়। সে হল রূপচাঁদ সিং। ভারী মুশকিল, না, মিঃ সরকার? যে গাড়িতে করে আপনি বেৰ্ছশ মিস্টার সেনকে নিয়ে গেছিলেন পাহাড় থেকে ফেলে হত্যা করতে, তার ড্রাইভার–যাকে হয়তো আপনি ভালরকম ঘুষ দিয়েছিলেন–সে যদি হঠাৎ আরও লোভী হয়ে পড়ে, এবং আপনাকে ব্ল্যাকমেল করে হুমকি দিয়ে আরও টাকা আদায় করতে চায়? ভারী মুশকিল! তখন তাকে খতম করা ছাড়া আর রাস্ত থাকে কি?

মিথ্যে, মিথ্যে, মিথ্যে!–মরিয়া হয়ে চিৎকার করে উঠলেন মিঃ সরকার।

কিন্তু যদি প্রমাণ হয় যে তার মাথায় যে গুলিটো লেগেছিল সেটা আপনার এই রিভলভারটা থেকেই বেরিয়েছে, তা হলে?

মিঃ সরকার আবার নেতিয়ে পড়লেন। বেশ দেখতে পাচ্ছি যে ভদ্রলোকের সমস্ত শরীর ঘামে ভিজে গেছে। আমিও ঘামছি, তবে সেটা শ্বাসরোধ করা উত্তেজনায়। ফেলুদার খাতায় লেখা ছিল কালোডাক। এখন বুঝতে পারছি সেটা হল ব্ল্যাকমেল। আমার পাশে লালমোহনবাবু যেন ফেনসিং ম্যাচ দেখছেন। কথার তলোয়ার খেলায় ফেলুদার জুড়ি নেই সেটা স্বীকার করতেই হবে। আর সে খেলা এখনও শেষ হয়নি।

অতএব রূপচাঁদ সিং হল মাডার নাম্বার ওয়ান, ফেলুদা বলে চলল। –এখন দ্বিতীয় মুশকিলে আসা যাক। সেটা হল শ্রীক্ষেত্রে গোয়েন্দার আগমন। ফেলুমিত্তিরকে ধোঁকা না। দিয়ে সরকার মশাইয়ের কার্যসিদ্ধি ছিল অসম্ভব। সেখানে বলব যে, বিলাস মজুমদারের ভূমিকায় নিজেকে এস্টাবলিশ করতে, এবং নিজের অপরাধ একজন স্মৃতিভ্রষ্ট অসহায় প্রৌঢের স্কন্ধে চাপাতে, তিনি বেশ কিছুটা সফল হয়েছিলেন। এই সাফল্যই তাঁর মনে

একটা বেপরোয়া ভাব এনে দেয়। পরিকল্পনা খুবই সহজ। পুঁথি এনে দিতে পারলে হিঙ্গোরানি কিনবেন; সরাসরি মালিকের কাছ থেকে কেনার উপায় নেই, কারণ দুর্গাগতিবাবুর টাকার লোভ নেই এবং পুঁথিগুলি তাঁর প্রাণস্বরূপ। সুতরাং আলমারি থেকে পুঁথি বার করতে হবে। উপায় কী? অতি সহজ। কাজটা করবেন লক্ষ্মণ ভট্টাচার্য, কারণ এ কাজ তিনি বেশ কিছুদিন থেকেই করে আসছেন। আগে পুরো টাকাটাই তিনি নিজে পকেটস্থ করেছেন; এখানে টাকার অঙ্কটা অনেক বেশি, কাজেই সেটা অন্যের সঙ্গে শেয়ার করতে আপত্তি নেই। কিন্তু এখানে একজনের কথা একটু ভাবতে হবে। সেক্রেটারি নিশীথ বোস।

ফেলুদা থামল। তারপর লক্ষ্মণ ভট্টাচার্যের দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, মঙ্গল রোডে কীর্তনের কথা বলেছিলেন না আপনি?

লক্ষ্মণ ভট্টাচার্য একটা বেপরোয়া ভাব আনবার চেষ্টা করে বললেন, মিথ্যে বলেছি?

না, মিথ্যে বলেননি, বলল ফেলুদা, প্রতি সোমবার সেখানে কীর্তন হয় সেটা ঠিকই! কিন্তু আপনি যে বলেছিলেন। আপনি সেখানে যান, সেটা ঠিক না। আপনি কোনওদিন যাননি। আমি খোঁজ নিয়েছি। তবে এ বাড়ি থেকে একজন যেতেন। নিশীথ বোস। সোমবার বিকেলে পাঁচটা থেকে সাড়ে ছটা নিশীথবাবু বাড়ি থাকতেন না। চাকর থাকত। এই সোমবার অর্থাৎ গত কালও নিশীথবাবু ছিলেন না। চাকরাটা অপদার্থ। তাকে ঘুষ দিয়ে হাত করা কিছুই না। আপনি দুপুরে মিঃ সেনের ঘুমের ওষুধের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়ে সাড়ে পাঁচটায় তাঁর ঘরে ঢুকে, বালিশের নীচ থেকে চাবি বার করে নিয়ে আলমারি থেকে পুঁথি বার করে নিয়ে যান। সেটা মিঃ সরকারের হাতে তুলে দিতে হবে। তার জন্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয় ভুজঙ্গ নিবাসের বারান্দায়। আপনি অপেক্ষা করছিলেন সেখানে। আপনার জুতোর ছাপ, আপনার দেশলাইয়ের কাঠি ও আপনার পানের পিক তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। কিন্তু এই সময় একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে যায়।

আমরা সবাই কাঠ। লক্ষ্মণ ভট্টাচার্য থর থর করে কাঁপছেন, কারণ মিঃ সরকার ছাড়া ঘরের সবাইয়ের দৃষ্টি এখন তাঁর দিকে।

ফেলুদা আবার শুরু করল– একজন আমেরিকান ভদ্রলোক সাড়ে ছটায় আসবেন মিঃ সেনের পুঁথি দেখতে। তাই ছটার মধ্যে নিশীথবাবু ফিরে আসেন। হয়তো কর্তাকে তখনও ঘুমোতে দেখে তাঁর সন্দেহ হয়। আলমারি খুলে দেখেন পুঁথির বদলে সাদা কাগজ। আপনি বাড়ি নেই। সন্দেহটা নিশ্চয়ই বাড়ে। বাইরে এসে দেখেন বালিতে পায়ের ছাপ। চলে আসেন ভূজঙ্গ নিবাসে। বলুন তো লক্ষ্মণবাবু, এই অবস্থায় তাকে কি বাঁচতে দেওয়া চলে? একটি ভোঁতা হাতিয়ার তো ছিল আপনার সঙ্গে, তাই না? তাই দিয়ে তাকে মেরে, লাশ সরিয়ে, সাগরিকায় ফিরে গিয়ে নিশীথবাবুর বাক্স বিছানা ভূজঙ্গ নিবাসে রেখে হঠাৎ খেয়াল হয়। হাতিয়ারে রক্ত লেগে আছে। তখন সেটা সমুদ্রের জলে ফেলতে গিয়ে পথে আমায় দেখে সেটা দিয়ে আমার মাথায় বাড়ি মেরে, তারপর সেটাকে জলে ফেলে দেন– তাই তো?

ফেলুদা জানে যে এ-প্রশ্নের কোনও উত্তর নেই, কিন্তু তাও সে থামল, কারণ পরের প্রশ্নটায় জোর দেবার জন্য। আদ্যিকালের পোড়ো বৈঠকখানার চার দেয়াল কাঁপিয়ে প্রশ্নটা করলে সে–

কিন্তু তাতেও কি আপনার কার্যসিদ্ধি হয়েছিল?

উত্তরটাও ফেলুদাই দিল, কারণ লক্ষ্মণ ভট্টাচার্যকে দেখে মনে হয়, তিনি বাক্যবাণে আধমরা।

না, তাতেও হয়নি। সে পুঁথি হিঙ্গোরানি পায়নি। মিঃ সরকারও পাননি। তাই অন্য পুঁথিটিকে সরাবার দরকার হয়েছিল আজকে। তার আগে, হয়তো কাল রাত্রেই, আপনি নিশীথবাবুর মায়ের অসুখের গল্পটি ফেঁদেছেন। কিন্তু প্রথম দিন এত করেও আপনার পরিশ্রম ব্যর্থ হল কেন সেটা এদের একটু বুঝিয়ে বলবেন? বলবেন না? তা হলে আমিই বলি–কারণ

এত আশ্চর্য একটি ঘটনা বর্তমান অবস্থায় আপনার পক্ষে গুছিয়ে বলা সম্ভব না। আমি অনেক রহস্যের সমাধান করেছি। কিন্তু বর্তমান রহস্যটি এতই অদ্ভূত ও অসামান্য যে, আমাকে বোকা বানিয়ে দিয়েছিল। ভোঁতা হাতিয়ারের কথা বলছিলাম, কিন্তু সেই ভোঁতা হাতিয়ার যে প্রজ্ঞাপারমিতার পুঁথি, তা আমি কী করে বুঝব? আপনার হাতে যে আর কিছুই ছিল না, তা আমি কী করে বুঝব! নিজের মাথায় কাঠের পটার বাড়ি সত্ত্বেও আমি বুঝিনি। সেই রক্ত লাগা পুঁথি কেমন করে আপনি সরকারের হাতে তুলে দেবেন, আর সরকারই বা হিঙ্গোরানিকে দেবেন। কেমন করে?

হায়, হায়, হায়!-দুর্গতি সেন দু হাত মাথায় দিয়ে উপুড় হয়ে পড়েছেন। –আমার এত সাধের পুঁথি শেষটায়–

আপনাকে একটা কথা বলি মিস্টার সেন–ফেলুদা দুর্গাগতিবাবুর দিকে এগিয়ে এসেছে–আপনি কি জানেন যে সমুদ্র মাঝে মাঝে দান গ্রহণ করে না, ফিরিয়ে দেয়? এমনকী তৎক্ষণাৎ ফিরিয়ে দেয়?

এবার ফেলুদা তার ঝোলার ভিতর হাত ঢুকিয়ে টেনে বার করল আরেকটা শালুতে মোড়া পুঁথি।

এই নিন। আপনার অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা। এটাকে নাই মামা বলতে পারেন। শালু যেমন ছিল তেমনই আছে। পাটার রং ফিকে হয়ে গেছে, তবে লেখা যে খুব বেশি নষ্ট হয়েছে তা বলব না। কাপড় আর কাঠ ভেদ করে জল বেশি ঢুকতে পারেনি।

কিন্তু, কিন্তু–এ আপনি কেমন করে পেলেন মশাই! লালমোহনবাবু জিজ্ঞেস না করে পারলেন না।

ফেলুদা বলল, এই শালুটা আপনিও দেখেছিলেন আজ সকালে। রামাই নামে নুলিয়া বাচ্চাটি মাথায় জড়িয়ে বসে ছিল। দেখেই সন্দেহ হয়। নুলিয়া বস্তিতে গিয়ে খোঁজ করে আমি আজই সকালে এটা উদ্ধার করি। পুঁথিটা পেয়ে ছেলেটি তার মার কাছে দিয়ে আসে।

শালুটা সে নিয়ে নেয়, পাটা আর পুঁথি ওদের ঘরেই সযত্নে রাখা ছিল। দশ টাকা দিয়ে কিনতে হয়েছে আমায়। মিঃ মহাপাত্র, মিঃ সরকারের পকেট থেকে পার্সটা নিয়ে তার থেকে দশটা টাকা বের করে দিন তো আমায়।

***

দুর্গাগতিবাবুর বাড়ির ছাত থেকে সমুদ্রটা যে আরও কত বিশাল দেখায় সেটা আজ ছাতের পাঁচিলের ধারে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারলাম।

কাল রাত্রে সব চুকে যাবার পর মিঃ সেন বার বার অনুরোধ করলেন, আমরা যেন সকালে তাঁর বাড়িতে এসে কফি খাই। মহিমবাবু রাত্রে বাপের সঙ্গেই থাকলেন, কারণ নিশীথবাবু নেই, চাকরাটাও ঘুষ পালিয়েছে। ফেলুদা কথা দিয়েছে, শ্যামলাল বারিককে বলে একজন চাকরের বন্দোবস্ত করে দেবে। রান্নার একটা লোক অবিশ্যি আছে; সে-ই কফি করে এনেছে আমাদের জন্য, আর সে-ই ছাতে চেয়ার পেতে আমাদের বসবার জায়গা করে দিয়েছে।

এখানে বলে রাখি, পুঁথি উদ্ধার করার জন্য ফেলুদা যা পারিশ্রমিক পেয়েছে, তাতে ওর গত তিন মাসের বসে থাকা পুষিয়ে গেছে। ও অবিশ্যি ওর স্বভাব অনুযায়ী প্রথমে টাকা নিতে আপত্তি করেছিল, কিন্তু শেষে বাপ-ছেলের পীড়াপীড়িতে চেক নিতেই হল। লালমোহনবাবু পরে বলেছিলেন, আপনি না নিলে আপনার মাথায় আবার ব্লান্ট ইনস্ট্রুমেন্টের বাড়ি পড়ত, এবং সেটা মারাতুম। আমি। এ সব ব্যাপারে আপনার হ্যাঁ-না, না-হ্যাঁ ভাবটা ডিজগাসটিং।

কফি খেতে খেতেই ফেলুদা বলল, আপনি কি জানেন মিঃ সেন, আমার কাছে সবচেয়ে বড় রহস্য ছিল আপনার গাউট?

দুর্গাগতিবাবু কপালে ভুরু তুলে বললেন, কেন, এতে রহস্যের কী আছে? বুড়ো মানুষের গাউট হতে পারে না?

কিন্তু গাউট নিয়েই তো আপনি সকাল-সন্ধে সমুদ্রের ধারে দিব্যি হেঁটে বেড়ান। গোড়ায় এসে পায়ের ছাপ দেখেছি, এবং মুখের মতো ভেবেছি সেটা বিলাস মজুমদারের ফুটপ্রিন্ট। কিন্তু কাল যে আপনাকে স্বচক্ষে দেখলাম।

তাতে কী প্রমাণ হল মিঃ মিত্তির? গাউটের যন্ত্রণা যে সর্ব্বক্ষণ স্থায়ী, এমন তো নয়। কিন্তু আপনার পায়ের ছাপ যে অন্য কথা বলছে, মিঃ সেন। সে কথাটা কাল রাত্রে বলিনি, কারণ আমার বিশ্বাস কথাটা আপনি গোপন রাখতে চান। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে কী, গোয়েন্দার কাছ থেকে যে সব কিছু গোপন রাখা যায় না। আপনার বাঁ হাতের লাঠিটাই যে শুধু তাৎপর্যপূর্ণ তা তো নয়, আপনার দুটো জুতোর ছাপে যে বেমিল রয়েছে।

দুর্গাগতিবাবু চুপ করে চেয়ে আছেন ফেলুদার দিকে। ফেলুদা বলে চলল, সেদিন কাঠমাণ্ডুর বীর হাসপাতালে ফোন করে বিলাস মজুমদারের ইনজুরির ব্যাপারটা কনফার্মড হয়। সেখানে ওই সময়ে পাহাড় থেকে পড়ে জখম হওয়া আর কোনও পেশেন্ট আসেনি। শেষে গাইড বুকে দেখলাম কাঠমাণ্ডুর কাছেই পাটানে আরেকটা হাসপাতাল আছে—শান্তা ভবন। সেখানে ফোন করে জানি যে দুগার্গতি সেন অক্টোবর থেকে জানুয়ারির গোড়া পর্যন্ত সেখানে ছিলেন। আপনার ইনজুরির বর্ণনাও তারা দিল।

দুর্গাগতিবাবুর মুখের চেহারা পালটে গেছে। একটুক্ষণ চুপ থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, নিশীথ জানত যে আমি ব্যাপারটা কাউকে জানতে দিতে চাই না; সকালে কেউ আসার থাকলে ও-ই ব্যান্ডেজ বেঁধে দিত, আর জিজ্ঞেস করলে বলত গাউট; আজ মহিম বেঁধে দিয়েছে ব্যান্ডেজ। এ জিনিস আমি প্রচার করতে চাইনি, মিঃ মিত্তির। একটা মহামূল্য পুথি হারানোর চেয়ে এটা কিছু কম ট্র্যাজিক নয়। কিন্তু আপনি যখন বুঝেই ফেলেছেন——

দুর্গাগতিবাবু তাঁর বাঁ পায়ের ট্রাউজারটা বেশ খানিকটা তুলে ফেললেন। অবাক হয়ে দেখলাম ব্যান্ডেজট শুধু গোড়ালির ইঞ্চি তিনেক উপর অবধি। তার উপরে আসল পায়ের বদলে রয়েছে কাঠ আর প্লাস্টিকে তৈরি যান্ত্রিক পা!